উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা পর্যায়

তৃতীয় সেমেস্টার

সফট পত্র (আবশ্যিক) ৩০৩

বাংলা ছোটগল্প

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:
The Registrar,
University of North Bengal,
Raja Rammohunpur,
P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,
West Bengal, Pin-734013,
India.
Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008
Fax: (0353) 2776313, 2699001
Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in
Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় –ক

একক ১ - রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

একক ২ – গল্পগুচ্ছঃ-নির্বাচিত গল্প – দেনাপাওনা, শাস্তি, কঙ্কাল।

একক ৩ - গল্পগুচ্ছঃ-নির্বাচিত গল্প – খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, একরাত্রি, নষ্টনীড় ।

একক ৪ – গল্পগুচ্ছঃ-নির্বাচিত গল্প – হালদার গোষ্ঠী , স্ত্রীর পত্র।

একক ৫ - প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাংলা ছোটগল্প

একক ৬ – প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাংলা ছোটগল্প ও অন্যান্য গল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ।

একক ৭ - প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিম্নবিত্ত জীবনের ভিন্নধর্মী বয়ান।

পর্যায় –খ

একক ৮ - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক সত্তা ও সমকাল

একক ৯ – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পকেন্দ্রিক আলোচনা

একক ১০ - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্পের আলোচনা

একক ১১ – সতীনাথ ভাদুড়ী - গল্পসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও লেখক সত্তা

একক ১২ - সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় – চকাচকি, চরণদাস এম এল এ।

একক ১৩ – সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় - ডাকাতের মা।

একক ১৪ - সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় - পত্রলেখায় বাবা, বৈয়াকরণ।

কোর পত্র – ৩০৩ (আবশ্যিক) **বাংলা ছোটগল্প**

পর্যায় –ক

একক ১ - রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প - আরম্ভের কথা, সময়গত বিন্যাসে রবীন্দ্রছোটগল্পের অভীপ্সা।

একক ২ – গল্পগুচ্ছঃ-নির্বাচিত গল্প – দেনাপাওনা, শাস্তি, কঙ্কাল - দেনাপাওনা – গল্প ও গল্পের গভীরে, শাস্তি – গল্প ও গল্পের অন্তর্গত বিশ্লেষণে, কঙ্কাল – গল্প ও গল্পের ভিতরকার কথা ।

একক ৩ - গল্পগুচ্ছঃ-নির্বাচিত গল্প – খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, একরাত্রি, নষ্টনীড় - খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন – গল্প ও গল্প কেন্দ্রীক আলোচনা , একরাত্রি – গল্প ও গল্পধর্মী বিশ্লেষণ , নষ্টনীড় - গল্পের অন্তর্গত চরিত্রায়ণ ,

একক ৪ – গল্পগুচ্ছঃ-নির্বাচিত গল্প – হালদার গোষ্ঠী , স্ত্রীর পত্র - হালদার গোষ্ঠী- গল্পের গভীরের কথা , স্ত্রীর পত্র – গল্পের অন্তর্গত গভীরে ।

একক ৫ - প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাংলা ছোটগল্প - প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাংলা ছোটগল্প - মধ্যবিত্তের সংকট ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প , তেলেনাপোতা আবিষ্কার গল্প আলোচনা।

একক ৬ – প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাংলা ছোটগল্প ও অন্যান্য গল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা - পুন্নাম গল্পের কাহিনি বিশ্লেষণ ও গল্পের গভীরে আলোচনা, স্টোভ - প্রতীকী গল্প ও হয়তো- জীবনের অনিশ্চয়তার গল্প , শ্রেষ্ঠ গল্পের অন্যান্য গল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

একক ৭ - প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিম্নবিত্ত জীবনের ভিন্নধর্মী বয়ান - প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিম্নবিত্ত জীবনের ভিন্নধর্মী বয়ান, মোটবারো গল্পের নিরিখে দলিত সম্প্রদায়ের চিত্র।

এককঃ-১ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

বিন্যাসক্রম

১.১ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পঃ আরম্ভের কথা

১.২ সময়গত বিন্যাসে রবীন্দ্রছোটগল্পের অভীপ্সা

১.৩ অনুশীলনী

১.৪ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১.১ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পঃ আরম্ভের কথা

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্প ধারার সর্বজনবিদ্য ভগীরথ। তাঁর আগেও গল্প লেখা হয়েছে। কিন্তু ১৮৯১ সালে সাপ্তাহিক হিতবাদী'র সাহিত্য বিভাগে শিল্প সম্মত প্রতিক্রিয়ায় ছোটগল্পের জন্ম ও বিকাশ শুরু হয়। সব দেশেই আছে ছোটগল্পের সঙ্গে সাময়িক পত্র বা ছোটগল্পের আত্মীয়তার সম্পর্ক। ইউরোপে খবর নিলে দেখা যাবে সেখানেও মপাসা লিখেছেন 'গোলোয়া ও জিলে ব্লা'র পাতায় চেকভ 'অস্কলকি' ও 'বুদিলন্কি'তে আলায়ান পো লিখেছেন – 'সাটার্ডে কুরিয়ার' ও 'সাটার্ডে ভিজিটর' –এ রবীন্দ্রনাথও তেমনিই ছোটোগল্পের ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছেন হিতবাদী, সাধনা, ভারতী, সবুজপত্র প্রভৃতি সাময়িক পত্রের আধারে।

সংবাদপত্রের সঙ্গে ছোটগল্পের যোগাযোগের কারণ সমকালিনতা ও সংক্ষিপ্ততার দাবি। কর্মব্যবস্ততার গতি ছন্দে শিল্পবিপ্লব পরবর্তী ইউরোপীয় সমাজ জীবন তাঁর পূর্ববর্তী অলস ও ধ্রুপদী রূপ হারিয়ে খন্ড বিখন্ড হয়ে গিয়েছিল। সেই কথাসাহিত্য ছোট্টপরিসরে আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি করে বসল। অর্থনীতিতে ভাঙচুর, সমাজ জীবনে

বিবর্তন, শ্রেণীবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটেছিল। এর পাশাপাশি ফরাসি বিপ্লব, চার্টিস্ট আন্দোলন, মে দিবসের সংগ্রাম, প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর বিপর্যয়, নতুন অভিজাত বুর্জোয়া শ্রেণির মুখোমুখি উন্নত মস্তক শ্রমজীবী মানুষের নবীন চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছিল। শুরু হয়েছিল পরিবর্তনের দুর্বার স্রোতধারা। সেই কুলপ্লাবনে ভেসে গিয়েছিল অভিজাত নির্ভর ইতিহাস ও রোমান্সের প্রাসাদ। জেগে উঠেছিল নতুন সমাজে নতুন বাস্তবতায় পরিপূর্ণ অজস্র দ্বীপপুঞ্জ। উনিশ শতকের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে এটাই হয়ে উঠল ধ্রুব বাণী। আর সংবাদপত্রে বিবিধ ফিচার আর কল্পকাহিনির মাধ্যমে সেই সমাজ ও সামাজিক মানুষের প্রাত্যহিক জীবন বা দিন যাপনের বিচিত্র ঘটনা পাঠক মনে সংবেদনা সৃষ্টি করল। ফলে কি এদেশে আবার কি ওদেশে এক সময় এই সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের আধারে জন্ম নিল ছোটগল্প।

রবীন্দ্রনাথের তিরিশ বছর বয়সে ছোটগল্প লেখা শুরু হয়। ব্যক্তিগত বিষন্নতা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতায় তাঁর চিত্ত তখন সংক্ষুব্ধ। সেই মুহূর্তে যৌবনের স্বজন নির্জনের নিত্য সঙ্গমে পদ্মার বুকে প্রকৃতির মধ্যে শুরু হয় তাঁর আশ্রয় অন্বেষণ। এরফলে একদিকে মুগ্ধ কবি – দৃষ্টি অকৃপণ প্রকৃতির সৌন্দর্যে পুষ্ট হয়, অন্যদিকে কৃপণ পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ ও দৈণ্য সম্পর্কে গল্পকারের রূপকারী বিবেকের চৈতন্য লাভ ঘটে। বস্তুত পক্ষে জমিদারি পরিদর্শনে এসে কবি পূর্ব বাংলার গ্রামীণ পরিবেশে মুখোমুখখি হন। এই প্রথম স্বতন্ত্র বাস্তবতায় তাঁর জীবন বোধ হয় ভূমিলগ্ন, প্রসারিত এবং দ্বন্দ্বময়। বলা যায় স্রষ্টার এই বিশিষ্ট মর্মপাতের ফলেই তিনপর্বের গল্পগুচ্ছে নরনারীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় বৈচিত্র্য। এখানে আছে কখনও চরিত্রের স্বাভাবিকতার সঙ্গে উদার আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব, কখনও বা পরিবেশের মধ্যে বদ্ধ থেকে হয়ে পড়ার সঙ্গে হতে চাওয়ার দ্বন্দ্ব। এইভাবে গল্পগুচ্ছের মধ্যে আগাগোড়ায় দেখা যাবে চরিত্রের ক্রমোত্তরণের চিহ্ন। যেমন ‘ছুটি’ গল্পের ফটিক থেকে ‘আপদ’ নীলকান্ত এবং সর্বশেষে ‘অতিথি’ গল্পের তারাপদ মধ্যে দেখা যায় বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর জীবনের বদ্ধতা, বিদ্রোহ অথবা বিপথগামীতা। তবু শেষে মুক্তির ঠিকানা খুঁজে পাওয়ার যেন অনুক্ত নির্দেশ আছে। আবার ‘দেনাপাওয়া’ মেটাতে হৈমর জীবনধারণের সংকল্প। স্ত্রী পত্রে

মৃণালের প্রতিবাদমুখরতা থেকে অপরিচিতা গল্প কল্যানীর ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা বা পুরুষের সমান স্বপদে প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও মনে হয় যেন কোন আকস্মিক মনে হয় না। নারী মনের চেতনার ক্রমবিস্তারী অগ্রসরণে সুচিহ্নিত হয়েছে। স্রষ্টার এই উওস্থাপনার কৌশলে বিস্মৃত হয়ে কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর মত আমরাও অনুভব করি – "রবীন্দ্রনাথ ধীরে এগিয়েছেন হঠাৎ কিছু বদল ঘটাতে যান নি।"

১.২ সময়গত বিন্যাসে রবীন্দ্রছোটগল্পের অভীপ্সা

রবীন্দ্রনাথে গল্পের সময়ধারাকে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন ভাবে বিন্যস্ত করেছেন। অবশ্য বিন্যাসেও তেমন বর রকমের মতভেদ নেই। বিবিধ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গল্প গুলির কথা মনে রেখে মোটামুটিভাবে চারটি পর্যায়ে আমরা গল্পগুচ্ছ ও তদতিরিক্ত গল্পের সময়কাল আমরা চিহ্নিত করতে পারি। প্রথম পর্যায়েঃ ১৮৯১-১৮৯৫, দ্বিতীয় পর্যায়েঃ ১৮৯৮-১৯০৭, তৃতীয় পর্যায়েঃ ১৯১৪-১৯১৭, চতুর্থ পর্যায়েঃ ১৯৪০-১৯৪১

আমরা জানি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের হিতবাদীতেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের গল্প রচনার সূচনা মুহূর্তে লিখেছিলেন গুটি ছয়েক গল্প। বিষয়গত আবেদনে দেখা যায় – দেনাপাওনা আর রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতায় আছে সমাজ – সমালোচনা, 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি'তে বাস্তবের সংঘাতে ভাববিলাসের ট্র্যাজেডি , গিন্নীতে একটি শৈশব স্মৃতির পটভূমিকায় সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক রসসৃষ্টির আর 'পোস্টমাস্টার' গল্পে জীবন ও প্রকৃতির দ্বৈততার ছবি উঠে এসেছে। অন্যদিকে ছোটগল্পের আঙ্গিক সম্বন্ধে গল্পকারের স্বচ্ছ ধারণা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন চোখে পড়ার মতো, কেননা মাত্র বছর ছয়েক আগের লেখা ১৮৮৪-৮৫ তে লেখা ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা গল্পদুটিতে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দৈণ্য দেখে এ চমক আরো বেশি করে জাগে, বোঝা যায় এর অন্তরালে ছিল প্রস্তুতি পর্ব – বিলেতে বহু পাঠের অভিজ্ঞতা। 'ছোটবেলা'য় রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ স্বীকারোক্তির স্মৃতিকথন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্যঃ নানা দিক থেকে বিলেতের আবহাওয়ার কাজ চলতে লাগল মনের ওপর। আমার ওপর ভার পড়েছিল রোজ সন্ধ্যে

বেলায় রাত এগারো পর্যন্ত, পালা করে কাব্যনাটক ইতিহাস পড়ে শোনানোর। নিজেরমধ্যে নিয়েছি পূর্ব – পশ্চিমের হাত মেলানো"।

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের উদ্‌গাথা ও প্রধান শিল্পী। তাঁর হাতে ছোটগল্প সৃষ্টির কারণঃ- ১) পদ্মাতীরে শিলাইদহে জমিদারী দেখাশোনা, ও সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের অংশভাগী হওয়া। রবীন্দ্রনাথ নিহেই বলেছেন, 'গল্পগুচ্ছে বাংলায় ছোটগল্প আমি আরম্ভ করেছিলুম...গরীবের ঘরে তো অনেকেই জন্মেছে কিন্তু তারা দেখে নি ছোটগল্প বাংলার পল্লীর গল্প, এর আগে হয়নি।'

২) সংবাদপত্রে ছোট আয়তনের উপযোগী।

৩) চেকভ, গোর্কি, মোপাসা এল্যানে, পো প্রভৃতির ছোটগল্পগুলি আয়ত্ত করা।

৪) ছিন্নপত্রগুলি হল রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির সাজঘর।

তিরিশ বছর বয়সে পদার্পণ করে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ছোটগল্প রচনায় ঐশ্বর্য পর্বে তাঁর জীবন পাত্র অভিজ্ঞতায় উচ্ছলে উঠেছে। জোড়াসাঁকোর প্রাসাদ জীবনের গন্ডিবদ্ধতা ছেড়ে তিনি এসেছেন পূর্ববঙ্গে। পদ্মা তীরবর্তী মানুষের জীবন তরঙ্গ সুখ দুঃখের রৌদ্র ছায়া প্রাণ ভরে প্রত্যক্ষ করেছেন। পদ্মাবক্ষে বোটে, পদ্মার ধারে শিলাইদহের কুঠিতে বেশ কয়েক বৎসর বাস করেছেন। ঘুরে বেরিয়েছেন কালিগ্রাম, পতিসর, সাজাতপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। পল্লীবাংলার বহু বর্ণরঞ্জিত দৃশ্যপট নিকটবর্তী লোকালয়ের জীবন ধারার অশান্ত কলধ্বনি অহর্নিশ তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছে। গ্রাম বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাঁর চিত্রপটে। তাঁর এ যুগের কবিতায় ও ছোটগল্পে এ স্থানিক অভিজ্ঞতায় হয়েছে প্রধান উপজীব্য। এর আগে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত জনজীবনের এমন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন নি।

গল্পগুচ্ছের গল্পমালায় প্রকৃতি ও মানিবের এই ঐকতান ধবনিত হয়েছে গ্রামবাংলার জনপদবাসী মানবমানবীর সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ্য কবির বহু গল্পে তাঁর ছায়া বিস্তার করেছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিঃ-

"এক সময় আমি মাসের পর মাস পল্লী জীবনের গল্প রচনা করেছি। এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লী জীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয়নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির লেখকের অভাব ছিল না। তাহারা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের শিলরূপ সম্বন্ধে কবি বুদ্ধদেব বসু বলেছেন – "কখনও ভুলতে পারি না, তাঁর কবি তাঁর কবিতার কাছে কত কৃতজ্ঞ। তবু এক এক সময়ে মনে হয় যে, মানসসুন্দরী কবিতা আর কাবুলিওয়ালা গল্প যেন একই লোকের লেখায় নয়, যেন রবীন্দ্রনাথের একাধিক ব্যক্তির পাশাপাশি জায়গা ছিল – একজন খাঁটি কবি, আর একজন খাঁটি গল্পলেখক।"

১.৩ অনুশীলনী

১) ছোটগল্পের উদ্ভব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।

২) রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পদার্পণে কোন বিশেষ প্রণোদনা কাজ করেছিল আলোচনা কর।

৩) রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে ছোটগল্প কী ও কেন? ব্যাখ্যা কর।

১.৪ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ (১-৪)খন্ড, বিশ্বভারতী।

২) নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ।

৩) তপোব্রত ঘোষ, রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ, দে'জ।

এককঃ-২ গল্পগুচ্ছঃ-নির্বাচিত গল্প – দেনাপাওনা, শাস্তি, কঙ্কাল

বিন্যাসক্রম

২.১ দেনাপাওনা – গল্প ও গল্পের গভীরে

২.২ শাস্তি – গল্প ও গল্পের অন্তর্গত বিশ্লেষণে

২.৩ কঙ্কাল – গল্প ও গল্পের ভিতরকার কথা

২.৪ অনুশীলনী

২.৫ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

২.১ দেনাপাওনা – গল্প ও গল্পের গভীরে

দেনাপাওনা গল্পটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হিবাদী পত্রিকা ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক। প্রতি সপ্তাহেই রবীন্দ্রনাথের একটি ছোটগল্প থাকত। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় দেনাপাওনা প্রকাশিত হয়। ২৮ ভাদ্র ১৩১৭ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লেখেন "সাধনা বাহির হিবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। ... সেই পত্রে সপ্তাহেই আমি ছোটগল্প, সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।"

'দেনাপাওনা' রচিত হবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আরো দুটি ছোটগল্প লেখেন ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা। ঘাটের কথা ভারতী পত্রিকায় ১২৯১ বঙ্গাব্দে কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ও রাজপথের কথা নবজীবন পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১২৯১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত

হয়। এই দুটি গল্প নিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবক্তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছিল, বোধহয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়ও। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় গল্পদ্বয়কে গদ্যকথিকা বলে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন – "গল্পবস্তু বিশেষ স্পষ্ট না হইলেও রচনাতে ছোটগল্পের প্রায় সব লক্ষণই পরিস্ফুট।"

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প সংগ্রহ ছোটগল্প প্রকাশিত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দে এই সংকলনে এই দুটি প্রথম ছোটগল্প প্রথম ছোটগল্পের স্বীকৃতি লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের যথার্থ ছোটগল্পের স্রোতধারা হিতিবাদী পত্রিকা থেকেই আরম্ভ হয়, তা নিঃসন্ধেহে বলা যায়। আমাদের দেশে কন্যার বিবাহের সময় অমানবিক ও অর্থনৈতিক পণপ্রথা প্রচলিত রয়েছে ও সেই দাবি যথাযথভাবে পূরণ করতে অসমর্থ হলে শ্বশুরালয়ে দুঃসহ যন্ত্রণা, এমনকী অত্যাচার ও নির্যাতন চলে ও কন্যাপক্ষ বিশেষভাবে কন্যার পিতা যে অপমান ও অবহেলার সম্মুখীন হন তার জন্য বিবাহিত মেয়েদের মানসিক যন্ত্রণা ও উদ্‌বেগের সৃষ্টি হয় ও সে নিরাপত্তাহীনতা বোধ করে। তখন জীবন সম্পর্কে অনীহা ও বিতৃষ্ণা আসে, মৃত্যুই একমাত্র সমাধান বলে সে মেনে নিতে বাধ্য হয় বা তাকে তা মানতে বাধ্য করা হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। পণপ্রথার উপর ভিত্তি করে এই গল্পের মূল আখ্যানভাগ।

এই গল্পে নিরুপমার বিবাহের প্রাক্‌কালে বরপণের টাকা নিয়ে ঘটোনার অবতারণা হয়েছিল তা বর্ণনা করা যেতে পারে – "বিবাহসভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। রামসুন্দর আমাদের রায়বাহাদুরের হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলেন – 'শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয় শোধ করিয়া দিব।' রায়বাহাদুর বলিলেন, টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না"

'এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল। এই গুরুতর বিপদের যে মূল কারণ সে চেলি পরিয়া, গহনা পরিয়া, চন্দন লেপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাবী

শ্বশুরকুলের প্রতি তাহার খুব একটা ভক্তি কিংবা অনুরাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা যায় না।'

"ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপ বলিয়া বসিল, 'কেনা বেচা – দরদামের কথা আমি বুঝি না বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব।' বিবাহ একপ্রকার বিষণ্ণ নিরানন্দ ভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।"

বিবাহ দিনের ঘটনায় আগামী দিনিগুলো সম্পর্কে নিরুপমা শঙ্কিত ও উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ে। তার শঙ্কা ও উদ্‌বেগ শ্বশুরালয়ে যাবার সময় প্রকাশিত হয়েছে। "নিরু জিজ্ঞাসা করিল, 'তারা কি আমাকে আসতে দেবে না, বাবা?' রামসুন্দর বলিলেন, 'কেন আসতে দেবে না মা। আমি তোমাকে নিয়ে আসব'। "

রামসুন্দর মেয়েকে প্রায়ই দেখতে যান কিন্তু বেহাইবাড়িতে কোনো সমাদর পান না বরং বার বার অপমানিত হন – "বাহাইবাড়িতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি নাই। চাকরগুলো পর্যন্ত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনদিন বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনোদিন বা পান না।"

এখানে নিরুপমার উপর মানসিক নির্যাতন ও রামসুন্দরের মনে চাপ ও উদ্‌বেগ সৃষ্টি হয়েছে। নিরুপমাকে শ্বশুরগৃহে উঠিতে বসিতে মেয়েকে খোঁটা লাগাইতেছে। পিতৃগৃহের নিন্দা শুনিয়া ঘরে দ্বার দিয়া অশ্রুবিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

নিরুপমার প্রতি অনাদর গঞ্জনা ও অবহেলা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে তার দৈনন্দিন প্রয়োজনের কোনো খবর কেউ নিত না। শাশুড়ির আক্রোশ ছিল তীব্র ও তীক্ষ্ম – " যদি কোনো দয়াপরতন্ত্র প্রতিবেশিনী কোনো ত্রুটির উল্লেখ করে, শাশুড়ি বলে, 'ওই ঢের হয়েছে।' অর্থাৎ বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত, সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোনো অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।"

দিনের পর দিন রামসুন্দরের অপমান লাঞ্ছনা ও হীনমন্যতা নিরুপমা বুঝত – "নিরু বাপের মুখ দেখিয়া সব বুঝিতে পারিল। বৃদ্ধের পক্ক কেশে, শুষ্ক মুখে এবং সদাসংকুচিত ভাবে দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা প্রকাশ হইয়া পড়িল।"

রামসুন্দরকে সান্ত্বনা দেওয়া ও তাঁকে নিরুদ্‌বিগ্ন রাখার জন্য নিরুপমা বাড়িতে যেতে চেয়েছিল। রামসুন্দর পণের টাকার কিচগু অংশ তিন হাজার টাকা নিয়ে মেয়েকে আনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু রায়বাহাদুর তাচ্ছিল্য ও বক্রোক্তি করে টাকা গ্রহণ করেন নি। নিরুপমাকে যাবার অনুরোধ নির্দয় ও অভব্যভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। রামসুন্দর মেয়ের সঙ্গে দেখা না করে বাড়ি ফিরে গেলেন এবং স্থির করলেন "যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপর দাবি করিতে পারিবেন ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইবেন না।"

তিনি দীর্ঘদিন নিরুপমাকে দেখবার জন্য বেহাইবাড়ি যান নি। নিরুপমা বারবার লোক পাঠানো সত্ত্বেও রামসুন্দর দেখা করেন নি। নিরুপমা অভিমান করে লোক পাঠানো বন্ধ করে দিল। রামসুন্দরের মনে খুব আঘাত লাগল। স্থির করলেন পূজায় নিরুপমাকে নিয়ে আসবেনই।

রামসুন্দর ছেলেদের অজান্তে বাড়ি বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন। নিরুপমা জানতে পেরে রামসুন্দরকে টাকা দিতে বারণ করেছিলেন –

"তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবনল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম! না বাব, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তা ছাড়া আমার স্বামী তো এ-টাকা চান না।" নিরুপমার দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখে রামসুন্দরকে টাকা ফেরত নিয়ে যেতে হয়েছিল। দিনের পর দিন শাশুড়ির নির্মম কটূক্তি লাঞ্ছনা অপমান এমনকী দসাসদাসীদের অবহেলা, রামসুন্দরের প্রতি রায়বাহাদুরের তাচ্ছিল্য, অভব্যতা, ব্যঙ্গোক্তি ও রামসুন্দরের হীনমন্যতা, সংকুচিতভাব, দুশ্চিন্তা, দুঃসহ অবস্থা শেষ পর্যন্ত বাড়ি বিক্রয়ের সিদ্ধান্তের ফলে নিরুপমার ধৈর্য ও সহনশীলতা রক্ষা করার বাঁধ ভেঙ্গে পড়েছিল। বাপের দীনতা,

রামসুন্দরের আর্থিক অবস্থা, তার নিজের রুচিবোধ শান্ত ও সংযত মন তার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা স্তব্ধ করে রেখেছিল। মানুষ যখন অবিরত নিপীরন ও অপমানের অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন জত দুর্বল ও সহায় হোক না কেন নিরুপায় ও মরিয়া হয়ে প্রতিরোধ করতে উদ্যত হয়। তার আত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটে।

পণোপ্রথার ধারবাহিকতা প্রচলিত থাকায় দেশে সামাজিক মনোবিকৃতির সৃষ্টি হয়েছিল। রামসুন্দরের টাকা ফিরে নিয়ে যাওয়ার সংবাদ 'কোনো স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ দাসী' শাশুড়িকে জানিয়েছিল।

এই ঘটনার পর শ্বশুরালয়ে নিরুপমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। নিরুপমাকে বাড়ি যেতে দেওয়া তো দূরের কথা নিরুপমার সঙ্গে তার আত্মীয়স্বজনদের দেখা করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। দিনের পর দিন নিরুপমাকে শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিশেষভাবে শাশুড়ির রূঢ় ব্যবহার ও বাপের বাড়ির কটূ নিন্দা সইতে হত। অনাদর অবহেলা মায়ামমতাহীন আবেষ্টনী ও উদ্‌বেগে নিরুপমার মনে এক বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় - "সে- যে পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্তাগৃহিণীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে এই সংস্কার তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল।" তার নিজের প্রতি খেয়াল ছিল না। সবাস্থ্য ও নশরীরের প্রতি অবহেলা অযত্ন খাওয়ার অনিয়ম চলছিল। দাসদাসীরা মাঝেমধ্যে খাবার দিতে ভুলে গেলেও নিরুপমা নীরবে মেনে নিত। ফলে সে রোগে আক্রান্ত হল। গুরতর পীড়ার কথা জেনেও শ্বশুড়ালয়ে কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি। সে কোনো পথ্য ও সেবাযত্ন পাই নি বরং তাঁকে শাশুড়ির কাছে কতূক্তি ও বিদ্রুপ শুনতে হত – "কখনো বা বলিতেন দেখো না একবার, ছিরি হচ্ছে দেখো না, দিনে দিনে যেন পোড়াকঅ্যাঠ হয়ে যাচ্ছে।" শাশুড়ির এই উক্তি থেকে বোঝা যায় তিনি নিরুপমার গুরুতর রোগের কথা ভালোভাবেই জানতেন। রোগের অন্তিম পর্যায়ে "ওঁর সমস্ত ন্যাকামি" বলে নস্যাৎ করেছিলেন। নিরুপমা বাবা ও ভাইদের দেখতে চেয়েছিল – 'অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়িকে বলিল, বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব মা।' তার সকাতর অনুনয় তিনি নিষ্ঠুর ও নির্মম ভাবে প্রত্যাঘাত করেছিলেন। চিকিৎসার অভাবে

তীব্র মানসিক আঘাতে ওইদিনই নিরুপমার মৃত্যু হল। পণপ্রথার এই নির্দয়তাকে গল্পে তুলে ধরা হয়েছে।

২.২ শাস্তি – গল্প ও গল্পের অন্তর্গত বিশ্লেষণ

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় রবীন্দ্র প্রতিভা নিঃসৃত ফসল 'শাস্তি' গল্পটি। নিম্নবৃত্ত সমাজের পদদলিত অভাবের সংসারের প্রেক্ষাপটে গঠিত হোয়া এ গল্পে নরনারীর জীবনের টানাপোড়েন ও নিয়তির অনিবার্য নিয়মে শাস্তিলাভই হল এর মূল বিষয়বস্তু। যে সমাজের মানুষদের মধ্যে থাকে একে অপরকে প্রবল ও অকারণ সন্দেহ, একে অপরের উপর অভিমান সে সমাজস্থ দলিত পরিসরের মানব মানবীই এ গল্পের নায়ক নায়িকা।

রুই পরিবারের দুই ভাই দুখিরাম রুই ও ছিদাম রুই জন-মজুরের কাজ করে। দীন – দরিদ্র সংসারে তাদের দুই স্ত্রী যথাক্রমে রাধা ও চন্দরা সবসময়ই কলহে ব্যস্ত। রাধা বাড়ির বড় বউ সে স্বামী ছিদামের ভালোবাসা পাইওনি। স্বামী তাকে নিয়ে মিছে সন্দেহ করেছে। পুরুষ শাসিত সমাজের দলিত পরিবারের পদদলিত নারী হিসেবেই চন্দরাকে পাওয়া যায়। চন্দরাও স্বামীকে হারিয়ে ফেলার ভএ বাঁধন দেওয়ার চেষ্টা করত। গল্পকারের ভাষায় – "ছিদাম মনে করিতে চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রী লোক তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই, আর চন্দরা মনে করিত আমার স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোনদিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।"

চন্দরার স্বামী তাকে যে ঊল্য দেয় না তার সবথেকে বড় প্রমাণ তার ভাসুর তার বড় জা রাধাকে হত্যা করলেও তার স্বামী নিজের দাদকে বাঁচাবার জন্য সব অপরাধের দায়ভার চাপিয়ে খুনের মিথ্যা আসামীতে পরিণত করেছে চন্দরাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি ছিদাম রামলোচনকে বলেছে – "ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো পাইব না।" এর থেকে বোঝায় যে শ্বশুড়ালয়ে চন্দরার কোনো গুরুত্বই ছিল না।

কিন্তু চন্দরা এই দাসীত্ব মানতে পারে নি। সে নারীধর্মে বিশ্বাসী।চন্দরার সন্তান নেই তাই তার পিছুটানও নেই। জীবনের সবটুকু স্বামীকে দিয়ে তাকে ভালোবাসাকে চাইলেও স্বামীর ভালোবাসাহীন অবহেলাই তার কপালে জুটেছে। তাই স্বামীকে সে প্রত্যাখ্যান করতেও দ্বিধা বিভক্ত নয়।

'নারীর উক্তি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন – 'দিয়েছিলে হৃদয় যখন/ পেয়েছিলে প্রাণ – মন দেহ/ আজ হৃদয় নাই/ যতই সোহাগ পাই/ শুধুই তাই অবিশ্বাস বিষাদ সন্দেহ'

চন্দরাও এমনি এক উক্তিতে অভিমানের পটভূমি তৈরি করেছে – 'চন্দরা মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এ নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম – আমার হইজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।'

প্রেম, বিশ্বাসকে ভঙ্গ করে, সবথেকে কাছের মানুষ যখন চন্দরাকে ঠকিয়েছে চন্দরার তখন রাগ হয়নি বরং সেই রাগ অভিমানে পরিণোত হয়েছে। সে আত্ম-বিসর্জনে প্রস্তুত হয়েছে। জীবনের সবটুকু ত্যাগেও সে পিছপা হয়নি। চরম বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সে জীবনকে নয় জীবনের শেষের অনিবার্য মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণ করতে চেয়ে স্বামীকে বলেছে যেন 'আমার এ পথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে গেছে বেঁকে'। এখানে যেন দেখতে পাই চন্দরা নিজেকেই নিজে শক্তি দিয়েছে। সে ছিদামের দেওয়া মিথ্যা অপবাদের অভিমানে নিজেকেই নিজে শাস্তি দিয়ে হইজীবনের সকল বন্ধন ছিন্ন করতে চেয়েছে।

এ গল্পের প্রথম পর্যায় পাঠে মনে হবে যে শাস্তির শ্রেষ্ঠভাগ যেন চন্দরারই ভাগ্যে জুটেছে। তবে তা সঠিক নয়। মূল শাস্তি লাভ ঘটেছে ছিদামের। ছদাম প্রথমে নিজের অজান্তেই নিজেকে শাস্তি দিয়েছে, চন্দরার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে। সে ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের দাম্পত্য বিসর্জন দিয়েছে। এখানেই ঘটেছে তার শাস্তির প্রথম সূত্রপাত।

পরবর্তীতে ছিদামকে শাস্তি দিয়েছে তার স্ত্রী চন্দরা। মিথ্যা অপবাদের অভিমানে সে ছিদামকে ত্যাগ করে মৃত্যুকে বরণ করতে বেশি শ্রেষ্ঠ সুখ মনে করেছে। তাই ছিদাম

মিথ্যা অপবাদ দিলেও সে পুলিশের সামনে নির্বিরোধে, অভিমানে বলছে – "হ্যাঁ আমি খুন করিয়াছি।" এমনকি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করল।

এছাড়া ছিদাম যখন আদালতে উপস্থিত হল চন্দরা মুখ ফিরিয়ে নিল। 'জজ কহিলেন "সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলো এ তোমার কে হয়।" চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, "ও আমার স্বামী হয়।" প্রশ্ন হইল – ও তোমাকে ভালোবাসে না? উত্তর – উঃ ভারি ভালোবাসে।'

গল্পের সবশেষে জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জেন যখন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কাউকে দেখতে চাও? চন্দরা তখন নিজের মাকে দেখতে চায়। চন্দরা তাচ্ছিল্যের সাথে অভিমানে উত্তর দেয় "মরণ।।" এর মাধ্যমেই ছিদামেরও শাস্তি হতে দেখি আমরা।

এবারে দেখা জাঁক সেই চরিত্রটি অর্থাৎ যার কৃতকার্যের জন্য দুটি দাম্পত্য নষ্ট হল তার শাস্তি কিভাবে হয়েছে। অর্থাৎ দুখিরাম রুই এর শাস্তি; সেও অজ্ঞানতা ও ক্রোধবশত তার স্ত্রীকে হত্যা করে এবং নিজের দাম্পত্যকে নষ্ট করে। ফলে স্ত্রী হারা হয়ে তার শাস্তি হয়।

আবার তার ভাই তাকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে আরও কঠিন শাস্তির হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে আরও কঠিন শাস্তি তাকে দেয়। আ-জীবন সে তার স্ত্রী–ও পরোক্ষ ভাবে তার ভ্রাতৃবধূ হত্যার দায়ভার কাঁধে বয়ে জীবন কাঁটাবে। এর ফলে তার ভিতর যে অনুশোচনা বোধ ও বিবেকের কাছে ছোট হয়ে যাওয়ার অকথ্য যন্ত্রণা তাকে তাড়িয়ে চলবে তা সে সহ্য করতে পারবে না। কোনো মানুষই পারে না এমন মন কষ্টের জ্বালা সহ্য করতে। তাই সে আদালতে অজ্ঞান হয়ে যায়। এখানে দুখিরাম রুই এরও চরম শাস্তি হয়েছে।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আর কোনো চরিত্র কী শাস্তি পাই নি। আমার মনে হয় রাধার মৃত্যু তাকে হইলৌকিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে তবে শাস্তি দেয় নি বরং

রাধার মাতৃহারা কোলের সন্তানের শাস্তি হয়েছে। কারণ জ্ঞান হওয়ার আগেই মাতৃহারা হয়েছে সে।

তাই সবদিক পর্যালোচনা করে শাস্তি গল্পের শাস্তি প্রাপক চরিত্র হিসাবে চারটি যথারীতি – চন্দরা, ছিদাম, দুখিরাম ও রাধার একমাত্র সন্তানকে শাস্তি পেতে দেখি। আর এই চারটি চরিত্রর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাস্তি পেয়েছে ছিদাম যে, নিজের নিরপরাধ স্ত্রীকে কৌশলে বাঁচাতে চেয়েও বাঁচাতে পারেনি। তাই চন্দরার অকারণ মৃত্যুর দায়ভার ছিদামকেই আ-জীবন বয়ে চলতে হবে।

২.৩ কঙ্কাল – গল্প ও গল্পের ভিতরকার কথা

রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পগুচ্ছ’-এর অতিপ্রাকৃত গল্পমালার প্রথম গল্প ‘কঙ্কাল’। জমিদারি দেখাশোনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ যখন পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ ও সাহাজাদপুরে গিয়ে প্রকৃতির উন্মুক্ত পটভূমিকায় ‘সোনার তরী’ কাব্যের কবিতাগুলি রচনা করছিলেন ঠিক তখনই তার পাশাপাশি যে কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছিলেন তার মধ্যে ‘কঙ্কাল’ গল্পটি অন্যতম। গল্পটি সাধনা পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি লেখার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বাল্যজীবনের একটি স্মৃতিকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বাল্যকালে স্বগৃহে নানান বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে অস্থিবিদ্যাও ছিল ঠাকুর বাড়ির একটি অঙ্গ। একটি নরকঙ্কাল তাদের ঘরে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল অস্থিবিদ্যা শিক্ষার জন্য। এই অস্থিবিদ্যা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজের একটি ছাত্র রবীন্দ্রনাথ ও তার দুই সঙ্গীকে শেখাতেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন – “ ইহা ছাড়া ক্যাম্বেল মেডিকেল কলেজের একটি ছাত্রের কাছে কোন এক সময় অস্থিবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। তার দিয়ে জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনিয়া আনিয়া আমাদের ঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইল।”

কঙ্কাল গল্পটিতে ভৌতিক কাহিনি খুব অল্প মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। যেহেতু গল্পটির মধ্যে একটি অশরীরী আত্মার কথা আছে সেহেতু এটাকে অতিপ্রাকৃত গল্প বলে মনে

হলেও গল্পটির আরম্ভটুকু ছাড়া আর কোথাও আতঙ্ক পান্ডুর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়নি, অলৌকিক রহস্য কোথাও ঘণীভূত হয়ে ওঠেনি। অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একচেতন পদার্থ ঘরের দেওয়াল হাতড়ে তার মশারির চারপাশে ঘুরতে থাকে। তার ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পায় গল্পকথক। সে যে কী খুঁজতে থাকে পায় না। ফলে দ্রুতবেগে ঘরময় প্রদক্ষিণ করতে থাকে। বলা যায় শুধু এইটুকু উল্লেখ ছাড়া অতিপ্রাকৃতের আর কোন ইঙ্গিত গল্পটির মধ্যে নেই।

গল্পের পরবর্তীতে দেখা যায় গল্পকথক মনে সাহস সঞ্চয়ন করে তথাপি তার গা ছমছম করতে থাকলেও প্রশ্ন করে 'কে-ও'। তখন পদশব্দটি কথকের মশারির কাছে থেমে যায়। গল্পকথক শুনতে পান 'আমি! আমার সেই কঙ্কালটা কোথায় গেছে তাই খুঁজিতে আসিয়াছি।' গল্পকথক – পাশবালিশটা সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া চিরপরিচিতের মতো অতি সহজ সুরে বলিল – "এই দুপুরে রাত্রে বেশ কাজটি বাহির করিয়াছ তা, সে কঙ্কাল এখন আর তোমার আবশ্যক?" তখন কঙ্কালটি উত্তর দেয় – তার বুকের হাড় তার মধ্যেই ছিল, তাঁর ছাব্বিশ বছরের যৌবন যে তার চারিদিকে বিকশিত হয়েছিল। গল্প কথকের সাথে কঙ্কালের কথোপকথন থেকে ভয় দূরীভূত হয়। তখন গল্পটি আর ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে হয় না।

অতিপ্রাকৃত এই গল্পটিতে অশরীরীর আবির্ভাব যেটুকু অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, গল্পকথকের লঘু মন্তব্যে, হাস্যরসিকতায় তা অপসারিত হয়ে গেছে। প্রেতাত্মা মশারির কাছে এসে গল্প শোনাতে চাইলে কথক তাঁকে বলেছে – "যাহাতে মন প্রফুল্ল হইয়া ওঠে, এমন একটা কিছু গল্প বল।" গল্প কথকের এই উক্তি অতিপ্রাকৃত পরিবেশের রহস্যময়তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে যেন কোন এক ব্যক্তি তার প্রিয়জনের কাছে আনন্দদায়ক একটি গল্প শুনতে চেয়েছে। গল্পের শেষে প্রেতাত্মা গল্পটি কেমন লাগল জানতে চাইলে কথক উত্তর দিয়েছে, "প্রফুল্লকর"। এই সব উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে ভৌতিক পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া প্রেতাত্মাটি তার মত জীবনের ব্যর্থ প্রণয়ের করুণ কাহিনিটিকে ব্যক্ত করেছে তাতে তাঁকে একটি জীবিত নারী বলেই ভ্রম হয়। গল্প কথক মর্তলোক ও প্রেতলোকের সূক্ষ্ম সীমারেখাটুকু

ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছেন কেবল মাঝখানে ব্যবধান রচনা করেছে সূক্ষ্ম তন্তুতে বোনা এক মশারি যা জীবন মৃত্যুর সীয়া নির্ধারণকারী একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

ইউরোপীয় ভৌতিক গল্পকারদের সম্পর্কে ফ্রয়েড যে কথা বলেছিলেন অর্থাৎ দ্বিচারিণী সত্তার অভিব্যক্তি, আলোচ্য গল্পে রবীন্দ্রনাথ সেই একই কৌশল অবলম্বন করেছেন। মৃত্যুর পর দেহাবশেষের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সম্পন্ন না হলে, বিদেহী আত্মা পার্থিব আকর্ষোণের বাহিরে যেতে পারে না এবং বার বার তার দেহাবশেষের কাছে ফিরে আসে এবং ঘুরে বেড়ায়। সাধারণত এই ধারণাকে রবীন্দ্রনাথ উপাদান রূপে গ্রহণ করেছেন জাতে অতিপ্রাকৃত গল্পরস জমে ওঠে এবং পাঠকের মানসিকতার সঙ্গে খাপ খায়।

গল্পটি পাঠ করতে করতে আমরা যতই এগিয়েছি, অতি প্রাকৃত সীমার রেখা ততই স্মাল হতে হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। গল্পটি আরম্ভ হয়েছে নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্তী পর্যায়ে। শেষ পর্যায়ে গল্পটি আর অতি প্রাকৃতের ধারের কাছে থাকেনি। গল্পটি হয়ে উঠেছে মানুষের গল্প, ভালোবাসা ও আত্মরতির কাহিনি। অলৌকিক হতে গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজার অর্থই হল পুনরায় লৌকিক জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হওয়া। ডঃ সুকুমার সেন এই গল্পটিকে ভূত ছাড়া ভূতের গল্প বলে বর্ণনা করেছেন। এই গল্পে কায়াহীন ভূতের অস্তিত্ব ছাপিয়ে এক রক্তমাংসের মানবীর উগ্র জীবনবাসনা ধরা পড়েছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিড়াল’ রচনাটির কথা। আফিং সেবনে ঢুলু ঢুলু নেত্র এবং সেই বিড়ালের সঙ্গে সে যেমন একটি বিড়ালের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং সেই বিড়ালের সঙ্গে সে যেমন কাল্পনিক কথোপকথনে মত্ত হয়েছিল, ঠিক তেমনি অর্দ্ধজাগরণ ও অর্দ্ধনিদ্রার অবকাশে গল্প কথকের মনোলোকে উদিত হয়েছিল ঐ বিদেহী আত্মার যে তাকে গল্প বলেছে, প্রশ্ন করেছে উত্তর চেয়েছে। সুতরাং ভৌতিক গল্প বলতে যে অজানা আশঙ্কার শিহরণ জাগে, মৃত্যু পান্ডুর বিবর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তার কোন চিহ্ন বা লক্ষণ এখানে নেই।

ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃতের আভাস কেমন ভাবে ফুটে ওঠে তা রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি গল্প ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ পাঠ করলেই বোঝা যাবে। গল্পটির নামকরণের মধ্যে কেমন

একটা ভয় ভয় আভাস ফুটে ওঠে। দেড়শসপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের ওপরে শবেত প্রস্তর নির্মিত নির্জন পাষাণ পুরীতে কোন এক প্রেতাত্মা তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত হয়ে জীবিত মানুষকে গ্রাস করার জন্য পিশাচীর মতো বসে আছে। এখানে গা কেমন শিহরণ দিয়ে ওঠে। এরপর নির্জন সেই প্রাসাদে তরুণী ইরানী ক্রীতদাসীর পিছনে তুলার মাশুল কালেক্টর সমস্ত রাত ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তার মাঝে মাঝে মনে হয় কে যেন তাঁকে পিছন থেকে আস্তে ঠেলছে, আবার মনে হয়েছে কখনও বা পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকিয়ে বেদনাপূর্ণ আগ্রহে কটাক্ষপাত তার কণ্ঠে শোনা যায়। 'তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও।' এই গল্পে ভয়াবহ দবিগুন হয়ে ওঠে পাগল মেহের আলির কণ্ঠে – 'তফাৎ যাও তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।' এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে অতিপ্রাকৃত রহস্যের জাল বিস্তার করেছেন, 'কঙ্কাল' গল্পে তার আভাস নেই।

আমরা বুঝতে পারি গল্পকার গল্পটির মাধ্যমে নারী মনস্তত্ত্বকে তুলে ধরেছেন। যে নারী যৌবনে কনকচাঁপার মতো অসাধারণ সুন্দরী ছিল, বিবাহের দুমাস পরে স্বামীর মৃত্যু হলে বিষকন্যা বলে তার পরিচিতি হয় এবং বাপের বাড়ি ফিরে আসে। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি দাদা ছাড়া আর কেউ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এই পুরুষের চোখ দিয়ে নিজের সৌন্দর্যকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। ডাক্তার শশিশেখরকে সে ভালোবেসে বার বার ছুটে গিয়েছে তার কাছে। সে নারী অবসর যাপন করেছে শশিশেখরকে কল্পনা করে। সে বুঝেছে এই সমাজের কঠিন নিয়মে তার আশা পূর্ণ হবার নয় তাই সে ডাক্তার শশিশেখরের কাছে নানান কথার ছলে মৃত্যুর সহজ উপায়টি জেনে নিয়েছে।

শশিশেখরের সঙ্গে প্রেতাত্মার প্রেমের মধুর সম্পর্ক এই গল্পে একটি ইতিহাস রচনা করেছে। অন্তপুরে সে তার দাদার গৃহে একা, এই তার আত্মরতি। আর অহংবোধই এই আত্মরতির প্রাণ সুধা। তার সৌন্দর্য অহমিকা আমি চেতনাশ্রয়ী হয়ে 'অহং' এই পদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। সে তার পদসঞ্চারে অনুভব করে বিচ্ছুরিত হীরক দ্যুতির মতই সৌন্দর্য প্রভা যা হিল্লোলিত হয় তার চারিদিকে। বাগানে গাছ তলায় একাকী বসে থাকার সময় তার মনে হত সমগ্র পৃথিবী যেন তাঁকে ভালোবাসেছে, আকাশের সমস্ত নক্ষত্র তাঁকে নিরীক্ষণ করেছে। বাতাস ছল করে বারবার নিজের দেহশ্রীকে বন্দনা

করে। যে তৃণসনে সে পা দুটি মেলে বসত সেই তৃণ পুঞ্জকে যেন তার মনে হত বিশ্বের জুবা পুরুষেরা তার পাদস্পর্শ কামনায় সমবেত হয়েছে। মেয়েটির মনে হয়েছে তার পদ বন্দনাকারী পৃথিবীর সমস্ত জুবা পুরুষমন্ডলী বহু থেকে একে পরিণত হয়েছে, আর সে হচ্ছে শশিশেখর যার সঙ্গে মেয়েটির নিজের সত্তা ও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। শ্রীগৌড়াঙ্গকে যেমন বলা হয় রাঁধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি, মেয়েটিও এক সত্তায় ছিল অপার সৌন্দর্যময়ী এবং অন্য সত্তায় ছিল অপার সৌন্দর্যের ভোক্তা। এতদিন সে নিজেই নিজেকে দেখেছে, এখন সে শশিশেখরের চোখে নিজেকে ভোগ করতে লাগল। মেয়েটির কথায় – "আমি তখন একলা দুইজন হইতাম, আমি তখন ডাক্তার হইয়া আপনাকে দেখিতাম, মুগ্ধ হইতাম এবং ভালবাসিতাম এবং আদর করিতাম।"

আত্মমুগ্ধ এক নারীর মনস্তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবেই এক অপূর্ব কাব্যিক ভঙ্গীতে রূপায়িত করেছেন। লিরিক আবেদন এবং রোমান্টিক কল্পনা এখানে চুড়ান্ত শীর্ষবিন্দুকে স্পর্শ করেছে। বোঝা যায় প্রেমপ্রত্যাশী এই নারী এমন এক অবলম্বন খুঁজছে যাকে কেন্দ্র করে তার অচরিতার্থ যৌবন পূর্ণ তৃপ্তি খুঁজে পাবে।

বাগানে আয়না নিয়ে মেয়েটি যখন তখন আয়নায় তার নিজের ছবি ফুটে উঠত এবং শশিশেখর রূপে সে সেই সৌন্দর্য সুধা পান করত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র 'বিম্ববতী কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। আত্মগর্বি রাণী নিজেই নিজের রূপে আত্মহারা। প্রেম প্রত্যাশী মেয়েটি যখন অচরিতার্থ যৌবনের স্বাদ পূরণের জন্য এমন এক অবলম্বন খুঁজেছিল আর তখনই তার দাদ্র বন্ধু শশিশেখরকে দেখতে পায়। এই শশিশেখরকে কেন্দ্র করে তার প্রেমের উন্মেষ ঘটে। রোগ এবং চিকিৎসা সূত্রে এই প্রেম ঘনিষ্ট থেকে ঘনিষ্টতর হয়ে ওঠে। এর ফলে সমস্ত জগৎ তার কাছে হয়ে উঠেছে শশিময়। নিজের রূপেই মোহিত এই মেয়েটি যখন সন্ধ্যাবেলায় পুষ্প তরুতলে গিয়ে বসত তখন সে অনুভব করত সমস্ত পুরুষ জাতি যেন শশিশেখরের মূর্তি ধারণ করে তার চরণাগত হয়েছে। তাই সে কারণ অকারণে বেলা অবেলায় নির্জনে নিভৃতে প্রতিনিয়ত শশিশেখরকে অনুভব করতে লাগল। তার চলন বলন প্রসাধন সবই আবর্তিত হতে লাগল শশিকে কেন্দ্র করে। অশরীরী মেয়েটির প্রেম গাঢ় থেকে গাঢ়তর

হয়ে উঠল। যখন শশিশেখর তার দাদ্র গৃহে ডিস্পেন্সারী খুলে বসল। কিচগুদিন পরে জানতে পারল শশি ডাক্তার বিয়ে করছে বারো হাজার টাকার বিনিময়ে বিয়ে করছে অন্য এক মেয়েকে। তখনই সে প্রতিহিংসা পরায়ণা হয়ে উঠল। সৌন্দর্যের বিপরীতে এওতটা অবহেলা সে সহ্য করতে পারেনি। তাই একদিক থেকে এই গল্পটি আপাত অলৌকিক বাতাবরণে একটি নির্ভাজাল প্রেমের গল্প হয়ে থেকে গেছে।

২.৪ অনুশীলনী

১) দেনাপাওনা গল্পে নিরুপমার জীবনে কেমন করে সংকট নেমে আসে তা আলোচনা কর।

২) গল্পের নাম কেন দেনাপাওনা তোমার অভিমত ও মতামত দাও।

৩) শাস্তি গল্পের ঘটনাক্রম বিশ্লেষণ কর।

৪) কঙ্কাল গল্প কি আদৌ কোন ভৌতিক গল্প? তোমার যুক্তি কি? ব্যাখ্যা কর।

২.৫ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ (১-৪)খন্ড, বিশ্বভারতী।

২) নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ।

৩) তপোব্রত ঘোষ, রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ, দে'জ।

মন্তব্য

এককঃ-৩ গল্পগুচ্ছঃ-নির্বাচিত গল্প – খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, একরাত্রি, নষ্টনীড়

বিন্যাসক্রম

৩.১ খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন – গল্প ও গল্প কেন্দ্রীক আলোচনা

৩.২ একরাত্রি – গল্প ও গল্পধর্মী বিশ্লেষণ

৩.৩ নষ্টনীড় - গল্পের অন্তর্গত চরিত্রায়ণ

৩.৪ অনুশীলনী

৩.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন – গল্প ও গল্প কেন্দ্রীক আলোচনা

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন রবীন্দ্রনাথের সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। গল্পটির প্রকাশকাল ১২৯৮ সাল। গল্পটির রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ অবস্থান করছিলেন শিলাইদহে ও সেই পাশ্ববর্তী অঞ্চলে। এই শিলাইদহে পদ্মা নদী, সাজাদপুরে যমুনা নদী আর পতিসরে নাগর ও অস্রাই নদীর তীরবর্তী মানুষদের সাথে মিশে তার সাহিত্যসাধনা নবতর-পূর্ণতা লাভ করে। এই অর্ধশিক্ষিত মানুষদের সম্পর্কে তিনি ‘পঞ্চভূত’ প্রবন্ধে বলেছেন –

‘আমি ভাবিতে লাগিলাম, এখানকার এই যে সমস্ত নিরক্ষর নির্বোধ চাষাভুষার দল ব-থিওরিতে আমি ইহাদিগকে অসভ্য বর্বর বলিয়া অবজ্ঞা করি, কিন্তু কাছে আসিয়া প্রকৃতভাবে আমি ইহাদিগকে আত্মীয়ের মতো ভালোবাসি। এবং ইহাও দেখিয়াছি

আমার অন্তঃকরণ গোপনে ইহাদের প্রতি একটি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে... কেন আমি ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করি তাই ভাবিয়া দেখিতেছিলাম। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে যে একটি সরল বিশ্বাসের ভাব আছে তাহা অত্যন্ত বহুমূল্য। এমনকি তাহাই মনুষ্যত্বের চিরসাধনার ধন...সরলতায় মনুষ্য প্রকৃতির স্বাস্থ্য'

আলোচ্য গল্পের রাইচরণও এমনই সরল সাধারণ ভৃত্যের মতোই সে অত্যন্ত মুর্খ। তার সম্পর্কে গল্পে বলা হয়েছে – লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামাচিক্কণ ছিপছিপে বালক। সে তার প্রভু, প্রভুপত্নী ও তাদের একমাত্র পুত্রকে এতই ভালোবেসেছে তাদের সেবা করাকেই সে জীবনর ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু তবুও তারই অসাবধানতায় শিশুপুত্রটি পদ্মায় ডুবে মরে গেল এবং তার জীবনের সব সুখ শান্তি অন্তর্নিহিত হয়ে গেল। এরকম ঘটনার পর স্বাভাবিক ভাবেই তার কাজে জবাব হল। এবং রাইচরণ দেশে ফিরে গেল, সেখানে দৈবক্রমে তার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে ইহলোক ত্যাগ করল। প্রভুর একমাত্র ছেলেটিকে জলে ভাসিয়ে নিজে পুত্র সুখ অনুভব করা যেন এক মহাপাতকের কাজ মনে হতে লাগল – 'তবে খোকাবাবু আমার মায়া ছড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

এই 'বোধ' এর পর থেকে রাইচরণ তার নিজের ছেলেকে এমনভাবে মানুষ করতে লাগল যেন তার প্রভুর ছেলে, নিজের ছেলে নয়। এরপর ছেলের বারো বছর বয়সের সময় সে তার পূর্বতন প্রভু অনুকূলবাবু ও তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে জোড়হাতে বলে – 'প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করে লইয়াছিলাম পদ্মাও নয় আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি-'

এরপর রাইচরণ তার প্রভু ও প্রভুপত্নীর হাতে ফেলনাকে তুলে দিয়ে নিজে জনারণ্যে হারিয়ে যায়।

মোটামুটি ভাবে গল্পের কথাবস্তু এই। তবে গল্পের সামগ্রিক বিচারে গল্পের ভিরং বিস্তার নয়, গল্পের অন্তরঙ্গ গঠনই মূল বিবেচ্য। সমগ্র গল্পগ্রন্থের নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় এই গল্পটি একমেবাদ্বিতীয়ম্। বিশিষ্ট সমালোচক শ্রী প্রমথনাথ বিশী তার

‘রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প’ গ্রন্থে এই গল্পটি সম্বন্ধে বলেছেন – ‘কি পরিকল্পনা দুঃসাহসিকতায়, কি স্বল্পাক্ষরে চরিত্রচিত্রনে, কি দুরুহ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সপ্ততাল ভেদে এই গল্পের কোন তুলনা হয় না। আর পদ্মা নদীর সজীব দুর্দম চিত্র এই গল্পটিতেই প্রথম পাইলাম’

তাঁর এই বক্তব্যকে ধ্রুবতারা করে আমার এই গল্পের নিরিখে অন্তরঙ্গ ও গঠনগত দিকটি মনস্তাত্ত্বিকভাবে ও নতুন তত্ত্বের আঙ্গিকে বিচার করবার প্রচেষ্টা করব। ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’ গল্পের জে বিষয়গুলি আধুনিককালের ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত সেটি হল –

প্রথমত, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পের নামকরণের ইতিহাসে দেখা যায়, তৎকালীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আশ্বিন সংখ্যায় সাধনার বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপিত সূচীপত্রে এই গল্পটিকে ‘রাইচরণ’ নামে পাওয়া যায়। পরে বিচিত্র গল্প সংকলনে এবং মজুমদার এজেন্সির প্রকাশিত গল্পগুচ্ছে এর নামকরণ হয় ‘খোকাবাবু’। একেবারে শেষে বিশ্বভারতীর গল্পগুচ্ছ সংকলনে পুরনো ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’ নামটিই রবীন্দ্রনাথ বহাল রাখেন। এই নামপরিবর্তনের বিষয়টির ক্ষেত্রে বলা যায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক নামকরণের জায়গায় ঘটনামুখ্য বা থিমকেন্দ্রিক নামকরণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ‘প্রত্যাবর্তন’ বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে ছোটগল্পের প্রচলিত রীতির জায়গায় রূপকল্পের ব্যবহার তাঁর এই গল্পে করতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে খেলনার দৈহিক রূপের মধ্যে দেখিয়েছেন রাইচরণের হারিয়ে যাওয়া খোকাবাবুর ব্যতিক্রম। তাই এই গল্পে পুনর্জন্মবাদের মধ্য দিয়ে রূপকল্পের গঠন এর বিষয়টিও পাঠকের নজর এড়িয়ে যায় না।

তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের এই গল্পে খোকাবাবুর খেলনা হিসাবে ফিরে আসার বিষয়টি জন্মান্তরবাদের সম্বন্ধে এভাবেও বিচার করা চলে। যদিও রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে রাইচরণের ‘বিশ্বাস’ এর উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

চতুর্থত, জীববিজ্ঞানের বংশগতির সূত্রানুসারে বংশগতির মাধ্যমে উন্নততর জীবসৃষ্টির বিষয়টিও খোকাবাবুর ফেলনা রূপে প্রত্যাবর্তনের রূপকেই সূচিত করে।

পঞ্চমত, রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের রূপকথার ব্যবহার করেছেন। মিথ হল dramatic respresent of our deepest intectual life এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ রূপকথার জে বিষয়টি এনেছেন তা হল –

ক) রাজপুত্রের বিদেশগমন ও মৃত্যু।

খ) অলৌকিক উপায়ে পুনর্জীবন লাভ।

গ) স্মৃতিবিলোপ ও দুর্দশার মধ্যে কালযাপন।

ঘ) স্মৃতিপ্রাপ্তি ও প্রত্যাগমন প্রভৃতি।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পে উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের সঠিকভাবে প্রয়োগ দেখা যায়।

ষষ্ঠত, রাইচরণ তার প্রভুর বাড়িতে দাসের ভূমিকাতেই অভ্যস্ত, তাই যখন নিজের সন্তানের মধ্যে সে খোকাবাবুর প্রতিভাস দেখতে পেলে তখন নিজের সন্তানের সাথে তার সম্পর্ক দাড়ালো প্রভুভৃত্যের। এই অংশে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের মাধ্যমে মানবমনের বিচিত্র গতি প্রকৃতির দিকটিকে পাঠকের সামনে আনতে চেয়েছেন যা পরবর্তী সময়ের ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার মগ্নচৈতন্যের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

সপ্তমত, কেবল মানুষের উপর নয় প্রকৃতির উপর এই প্রাথমিক রূপকল্পের প্রতিফলন ঘটেছে। পদ্মা যেন খল্‌খল্‌ শব্দে শিশুকে তার খেলা ঘরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আবার শিশুটিকে গ্রাস করায় তার পদ্মার মধ্যে কোন চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায় না।গল্পকার এর ভাষায় –

‘কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল। যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন একমুহূর্ত সময় নাই।’৫

এখানে পদ্মা নদীর উপর মায়াবী বা মৃত্যুরূপা মাতার চিত্রকল্প আরোপিত হয়েছে।

তবে গল্পের বিশ্লেষণে একথা স্পষ্টভাবেই বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই গল্পে নানা লোক আঙ্গিকের মিশেল ঘটালেও এই গল্পের পরিণতিকে অত্যন্ত বাস্তবোচিত রূপ দিয়েছেন। তাই সেখানে ফেলনার অনুকূলবাবুকে পিতৃসম্বোধন ও রাইচরণকে প্রত্যাখ্যান রাইচরণের রূপকথার মায়াময় কল্পলোককে মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এর পর গল্পে রাইচরণের যাওয়া ও টাকা ফিরে আসার ঘটনা চূড়ান্ত বাস্তবের অভিঘাতে মাথায় ব্যাঙ্গানাভূতি মাত্র।

৩.২ একরাত্রি – গল্প ও গল্পধর্মী বিশ্লেষণ

শিলাইদহ পর্বে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'সাধনা' পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পকথক নায়ক জীবনপুরের সাথীহারা পথিক হয়ে দিশাহীন যাত্রায় পা বাড়িয়েছেন। আত্মকরুণার প্রসাদ নয়, আত্মমর্যাদাবোধই তাঁর কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়েছে।

'একরাত্রি' গল্পের বক্তা নামহীন নায়কের উত্তম পুরুষের জবানবন্দীতে গল্পটি পরিবেশিত। 'বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে' বঙ্কিমের এই বাণীই জারিত হয়েছে গল্পকথক – নায়কের জীবনে। জীবনের প্রভাতবেলা থেকে প্রতিবেশী আবাল্য বন্ধু ও সহপাঠিনী সুরবালার খেলার সাথী নায়ক 'সুয়ের যমুনাতে' হেলাফেলায় বিরহের স্রোতে অবগাহন করেছেন। সুরবালার উপর কারণে অকারণে শাসন উপদ্রবে মজে ছিল। অধিকারবোধের সঙ্গে অবক্তার ভাবও প্রকাশিত হয় – "আমি কেবল জানিতাম, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্যই সে আমার বিশেষ রূপ অবহেলার পাত্র।" নায়ক ইচ্ছা করলেই সুরবালাকে জীবন-পথের সাথী করতে পারতেন। কেননা তাদের দুটি পরিবারের বিন্দুমাত্র বাঁধা ছিল না – উপরোন্তু তারাও চেয়েছিলেন বাল্যপ্রেমকে বিবাহে রূপ দেবার। হাঠাৎ গল্পকথকের হৃদয়ে দেশপ্রেমের জোয়ার আছড়ে পড়ায় ব্যক্তিপ্রেমকে অবহেলা করে দেশনায়কের সবপ্নে মশগুল থেকেছেন – "দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণ বিসর্জন করা যে আশু আবশ্যক,

এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কী করিয়া উক্ত দুসাধ্য কাজ করা জাইতে পারে আমি জানিতাম না, এবং কেহ দৃষ্টান্তও দেখাইত না।" কিন্তু তাহা বলিয়া উৎসাহের কোনো ত্রুটি ছিল না।

গল্পকথকের পিতা জমিদার চৌধুরীর নায়েব পদে আসীন ছিলেন। স্বভাবতই পিতা তাঁরই পেশার পদাঙ্কনুসরণে সচেষ্ট হলে কথক পণ করেন কোর্টের হেডক্লার্ক হয়ে টাকা উপার্জন করে দিনাতিপাত করবেন। নায়েব মশাই ও সুরবালার পিতা তাদের বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত হলে কথক স্পষ্টত জানিয়ে দেন – "বিদ্যাভাস সম্পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না।" এই অবসরে কথকের সবপ্নের আবাল্য সহচরীর সাথে উকিল রামলোচনবাবুর বিবাহ হয়ে যায়। কথকের কর্ণকুহরে এই সংবাদ পৌছালে অনুশোচনায় দগ্ধ না হয়ে অবলীলায় বলে ওঠেন – "পতিত ভারতের চাঁদা আদায় কার্যে ব্যস্ত ছিলাম।" রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে সমকালীন রাজনীতির পরিবেশকে তুলে ধরেছেন। এন্ট্রান্স পাশ করার পর ফাস্ট আটর্স দেবার সময় পিতার হঠাৎ মৃত্যু হলে বিধবা মা ও বোনের মুখ চেয়ে নোয়াখালির স্কুলে সেকেন্ড মাস্টারির চাকরিতে যোগ দিলেন। দেশনায়কের অধরা স্বপ্ন ছাত্রদের মধ্যে বাস্তবে রূপ দেবেন ঠিক করলেও স্কুল কর্তৃপক্ষের বিমাতৃসুলভ আচরণে তা সম্ভব হল না। তাঁরা চান না ছাত্ররা সিলেবাসের বাইরে গিয়ে প্রথাগত শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দিক – "দেখিলাম, ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগজামিনের তাড়া ঢের বেশি। ছাত্রদিগকে গ্রামার অ্যালজেব্রার বহির্ভূত কোনো কথা বলিলে হেডমাস্টারে রাগ করে।" নায়কের স্বপ্নভঙ্গের এই বেদনা আমাদের হৃদয়াকাশেও ব্যথিত করে। রবীন্দ্র ভাবনারই ফসল নায়কের মধ্যে জারিত করে দিয়েছেন।

নিঃসঙ্গ ও আশাহত নায়কের জীবনে কাটে স্কুল সংলগ্ন সুপারি-নারিকেল গাছে ঘেরা পুষ্করিণির ধারে। এই স্কুলের অনতিদূরেই উকিল রামলোচনের বাসায় ভাবী ভারতবর্ষের দুরবস্থা সম্পর্কে আলোচনার মাঝেই তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণিত হল বেদনার সুর। অনুভব করলেন – "এমন সময়ে পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটা চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খস্‌খস্‌ এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম;

বেশ বুঝিতে পারিলাম জানলার ফাঁক দিয়া কোনো কৌতূহলপূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তৎক্ষণাৎ দুখানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল – বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশবপ্রীতি ঢলঢল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি। সহসা হৃদপিন্ডকে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিলে এবং বেদনায় ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল। নায়ক অনুভব করেছেন – ভালোবাসার এই কিরে খাজনা। দিয়ে ফাঁকি ওড়ে পাখি/ যতই ডাকি আর ফেরে না" নায়কের অন্তরাত্মা বেদনার বালুচরে গুমরে কেঁদে উঠেছে। বাসায় ফিরে অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ও বাইরের আলোড়নে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। বাসায় ফিরে খেসারত দিতে গিয়ে 'যে ছিল আমার সবপনচারিণী/ তারে বুঝিতে পারিনি'- এ ধরণের এক অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাঁর জীবনবীণার তার ছিন্ন বিছিন্ন হয়েছে। সুরবালার এত কাছে থেকেও লক্ষ যোজন ব্যবধান অনুভব করে মর্মে মর্মে ব্যথিত হয়েছেন। ব্যথাদীর্ণ হৃদয়ের অভিব্যক্তি – "ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারও মনে পড়ে পড়ে না, তাহার পরে বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা লইয়া অস্থির হইয়া মরে।" কারও ছোঁয়া চিরদিন হৃদয়ের গভীরে গোপনে দাগ কেটে যায়। নায়ক বেদনার পাষাণভার কাটাবার চেষ্টা করলেও কোনো কাজে মনঃসংযোগ করতে পারেন না। - "দুপুরবেলা ক্লাসে যখন ছাত্রেরা গুন গুন করিতে থাকিত, বাহিরের সমস্ত ঝাঁ ঝাঁ করিত, ঈষৎ উত্তপ্ত বাতাসে নিমগাছের পুষ্পমঞ্জরির সুগন্ধ বহন করিয়া আনিত, তখন কী ইচ্ছা করিত জানি ।" আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না সুরবালা নায়কের শৈশব স্মৃতির মগ্ন চৈতন্যে চিরভাস্বর হয়ে আছে। নায়কের ঘরে নয় – মনের গহন সরোবরে দিবস রজনী সুরবালা খেলাঘর বাঁধতে থাকে।

সমগ্র গল্পজুড়ে সুরবালার সবাক উপস্থিতি না থাকলেও প্রচ্ছন্নভাবে সুরবালাই গল্প-কাহিনির মধ্যে উত্তম পুরুষে বর্ণিত জাবতীয় অন্তর্বেদনা ও বিষাদময়তার কারণ হয়েছে। রামলোচন যেদিন মোকদ্দমার কাজে বাড়ির বাইরে সেদিনই সারাদিন বৃষ্টি নামল। এই বৃষ্টি আসলে নায়কের অশ্রুবারি। বন্যার ঢেউ মৃত্যুরই পর নাম। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে নায়ক । রাত্রি দেড়টার সময় নিজেকে বাঁচানোর জন্য নয় – অন্তরের

ভালোবাসার টানে সুরবালাকে বাঁচানোর প্রয়াসেই ছুটে গেছেন। বন্যার জল পুকুরপাড় অতিক্রম না করায় কারো মৃত্যু হয়নি – উভয়েই কোনো কথা না বলে বাসায় ফিরে গেছেন। নায়ক চেয়েছিলেন দুজনের জীবননদী যেন মৃত্যুর সমুদ্রে এক হয়ে যায়। নায়ক মহাপ্রলয়ের রাত্রে সুরবালার ক্ষণিক সান্নিধ্যে অনন্ত আনন্দের স্বাদ পেয়েছেন –

"দুজনে দেখা হল মধুযামিনী রে –

কেন কথা কহিল না, চলিয়া গেল ধীরে।।"

মৃত্যুস্রোতের উজানে একরাত্রি মর্ত্যভূমির জীবনচর্যার অতীত ভেক শাশ্বত মুহূর্তের প্রতীকরূপী। প্রলয় ও বন্যার হুঙ্কার যেন নায়কের অস্থির মানসিকতার দ্যোতক। দেহতৃষ্ণার অতীতে কামনা বাসনার উর্দ্ধে সব পাওয়ার এক অনির্বচনীয় আনন্দে নায়কের শূন্য ভান্ডার পূর্ণ হুয়ে উঠেছে। জীবনের পেয়ালায় যতদিন উত্তাপ থাকে, ভুলে থাকি বেদনার ভাষা। উত্তাপ নিভে গেলেই নামে শ্রাবণের ঢল। বন্যায় ভেসে গিয়ে তখন একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে অবস্থান করে হৃদয়।

রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নায়কের মনের আকাশ থেকে বেদনার কালো চাদর সরে গেছে। এক অপরূপ প্রাপ্তিতে তাঁর সমস্ত মন আছন্ন – "আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি মাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।" নায়ক নিজের আত্মসংকট কাটিয়ে সুরবালার হৃদয় মন্দিরে স্থান পেতে চেয়ে যেন বলে ওঠেন – "ভালোবেসে সখী নিভৃত যতনে/ আমার নামটি লিখ/ তোমার মনের মন্দিরে" ব্যবহারিক ও লৌকিক তাৎপর্যের সীমা ছাড়িয়ে এই গল্প পাঠক চিত্তের অনুভবের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যানুভূতি সৃষ্টি করেছে। 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে' – দেহ প্রেমের খণ্ড ক্ষুদ্রতা বিলীন হয়েছে মানসলোকের ভাবসম্মিলনে।

ব্যক্তিপ্রেম বনাম দেশপ্রেমের দ্বন্দ্বে নায়ক ব্যক্তিপ্রেমকে বিসর্জন দিয়ে স্বদেশপ্রেমকেই হৃদয়মাঝারে স্থান দিয়েছেন। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে জীবন অতিবাহিত না করে সুরবালার মানসিক উপস্থিতিতে স্মবল করে সারাজীবন কাটাতে চান। নায়কের

জবানবন্দীতে গল্পের রস পরিণাম এক অপূর্ব ভাব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। জীবন ও প্রকৃতির মেলবন্ধনে গ্রথিত পারস্পরিক আকর্শোণ বিকর্ষণের মধ্য দিয়ে গল্পের পরিণতি এক গল্প রচনার কয়েকমাস পরে ‘সোনার তরী’ কাব্যের মানসসুন্দরী কবিতায় গল্পের ভাব বিরাজিত হয়েছে –

‘মিলনে আছে বাঁধা
শুধু এক ঠাই বিরহে টুটিয়া বাঁধা
আজি বিশ্বময় ব্যপ্তি হয়ে গেছ প্রিয়ে
তোমারে দেখিতে পাই সবর্ত্র চাহিয়ে।’

অস্থির সময়ের জটিল আবর্তে নায়কের স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনায় আমরাও সামিল হই। সময়ের স্রোতে সবকিছু ভেসে গেলেও মানুষের চিরজীবী প্রেম কোনদিনই হারিয়ে যায় না। গল্পে সেই ব্যঞ্জনাকেই তুলে ধরা হয়েছে।

৩.৩ নষ্টনীড়ঃ- গল্পের অন্তর্গত চরিত্রায়ণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প গুলির মধ্যে অন্যতম 'নষ্টনীড়' গল্পটি, ১৩০৮ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় আটমাস ধরে(বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় । ২০ টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, এত বড় একটি আখ্যানকে ছোটগল্প গল্প বলা যায় কি না, একটা প্রশ্ন থেকেই যায় । 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশের সময় এটিকে উপন্যাস বলে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল । 'সাহিত্য' পত্রিকায় সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি 'নষ্টনীড়' কে উপন্যাস হিসাবে অভিহিত করেন । ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীতে 'নষ্টনীড়' উপন্যাস হিসাবে স্থান পায় । কিন্তু মাত্র কয়েক বছর পরেই ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস এর সংকলন 'গল্পগুচ্ছ'এ নষ্টনীড় ছোটগল্প হিসাবে সংকলিত করা হয় । রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালেই 'নষ্টনীড়' উপন্যাস না ছোটগল্প এ নিয়ে বিতর্ক চলছিল । রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে কোন মন্তব্য করেন নি । 'নষ্টনীড়' কে নিয়ে রবীন্দ্র মানসে একপ্রকার দোলাচালতা ছিল । 'নষ্টনীড়' গল্প না উপন্যাস এখনও এ বিতর্ক বর্তমান ।

সাম্প্রতিক এক বিখ্যাত সমালোচক তপোব্রত ঘোষ 'নষ্টনীড়' কে উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন । 'নষ্টনীড়' আখ্যানটির কালগত বিস্তৃতি, ধীর গতিতে চরিত্রসমূহের আঁতের কথা উন্মোচন, মন্দাকিনী- উমাপতির উপকাহিনি ইত্যাদি উল্লেখ করে বলেছেন—

"আমরা 'নষ্টনীড়'কে উপন্যাস বলে মনে করি বলেই এটিকে ছোটগল্পশিল্পের আলোচনায় গ্রহণ করিনি ।"(১)

কিন্তু আমরা 'নষ্টনীড়' কে ছোটগল্প হিসাবেই আলোচনা করব । ছোটগল্প হিসাবেই অধিক পরিচিত('গল্পগুচ্ছ'য় স্বমহিমায় বিরাজমান) । ভাবের একমুখীনতাই নষ্টনীড়ের প্রধান বিষয় । দাম্পত্য জীবনের মধুর কোমল দিক অস্বীকার করে প্রগাঢ় শাস্ত্র আলোচনা ও বিদ্যার চর্চার কারণে জীবনে কী ধরনের অশান্তি নেমে আসতে পারে, জীবন কীভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, তাই গল্পে আভাসিত করে তোলা হয়েছে । আকস্মিক ভাবেই গল্পের আরম্ভ, ভূপতির কর্মব্যস্ততা ও চারুর নিসঙ্গ জীবনের বর্ণনা দিয়ে । মূল সংকটও হলো একটি, নিঃসঙ্গ চারুর জীবনের দুর্বিষহ পরিণতি । এবং আখ্যানের পরিণতিতেও ভূপতি-চারুর পরিণতি নিয়ে একটা অতৃপ্তিও পাঠকের মনে থেকে যায় । বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রায় একই সমস্যা । কিন্তু সেখানে সমস্ত সমস্যার সমাধান দেখানো হয়েছে, যা নষ্টনীড় ছোটগল্প বলেই তা সম্ভব হয়ে ওঠেনা । একটিমাত্র সমস্যা অর্থাৎ নিঃসঙ্গতার পরিণাম দেখানো এবং আখ্যানের শেষে অতৃপ্তি জনিত অন্তর বেদনার কারণেই 'নষ্টনীড়' সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠেছে ।

'নষ্টনীড়' ছোটগল্পটির মূল বিষয় হলো ভূপতি-চারুর দাম্পত্য জীবনে ঝড়ের মতো অমলের আবির্ভাব । ঝড়ে পাখির নীড় যেমন বিধ্বস্ত হয়ে যায়, তেমনই তাদের দাম্পত্যের নীড় নষ্ট হয়ে গেছে; তাই আখ্যানটির শিরোনাম 'নষ্টনীড়' । নামকরণটা বেশ লক্ষ্যণীয়, ঝড়ে পাখির নীড় ভাঙলে তা আবার গড়ে তোলার সম্ভাবনা থাকে । কিন্তু এ তো নারী-পুরুষের নীড়, সম্পর্কের নীড়, শুধুই ভাঙেনি, নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাই 'নষ্টনীড়' । কীভাবে একটা নীড় নষ্ট হয়ে গেল, কোন অভিঘাতে, কী তার পরিণাম তারই আখ্যান হলো 'নষ্টনীড়' । কিন্তু 'নষ্টনীড়' এর আখ্যান শুধুই নীড় নষ্ট হওয়ার আখ্যান নয়; নীড়

গড়ে ওঠার আখ্যানও ।

একটা 'নীড়' বা পরিবার বা সংসার যাই বলি না কেন, তা গড়ে ওঠে পারস্পরিক দায়িত্ব, কর্তব্য, প্রেম, ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে । দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক যে সব সম্পর্কের নীড় গুলো গড়ে উঠত(অবশ্যই দাম্পত্য) সেখানে প্রেম-ভালোবাসা অপেক্ষা গুরুত্ব পেত দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, সামাজিকতার উপর । প্রেম ভালোবাসাহীন মন নিয়েও শুধুমাত্র সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে যেতে হতো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে সেই ধারণার অনেকটাই পরিবর্তন ঘটছে । মানুষের মনকে প্রধান্য দেওয়া শুরু হলো, প্রাধান্য দেওয়া হলো মনের অন্তঃস্থলের গোপন কামনা বাসনা কে । সামাজিক সম্পর্কের বাইরে যে সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, গোপন মনের কামনা বাসনা থাকতে পারে, তা দেখালেন রবীন্দ্রনাথ; সমসাময়িক কালে প্রকাশিত 'চোখের বালি' ও 'নষ্টনীড়' আখ্যানে । তিনি চরিত্রের আঁতের কথাকে বের করে আনলেন । তাই 'নষ্টনীড়' এ চারু প্রাতিষ্ঠানিক দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে অমলের সঙ্গে 'নীড়' রচনার স্বপ্ন দেখেছে । যা সমাজ স্বীকৃত নয়, কিন্তু তাকে অস্বীকার করাও যায় না । অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামাজিক 'নীড়' এর ধারণা ভেঙ্গে যাচ্ছে । পাঠক মনে এক নতুন নীড়ের ধারণা তৈরি হচ্ছে, যা সমাজ স্বীকৃতির বাইরে গড়ে উঠছে । বাস্তব জীবনেও এমন ঘটনা প্রতি নিয়ত ঘটে থাকে । এখানেই আখ্যানটির সার্থকতা ।

'নষ্টনীড়' গল্পে মূলত তিনটি চরিত্র ভূপতি-চারু-অমলের হৃদয়ের টানাপোড়েনের কাহিনি। এদের মাঝে এসেছে উমাপতি ও মন্দাকিনী । কর্মব্যস্ত ভূপতি সংবাদ পত্র নিয়েই সদাব্যস্ত । অন্তঃপুরের দিকে তাকাবার অবসর তার নেই । এদিকে বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করলেও কর্মব্যস্ত ভূপতির সেদিকে খেয়াল রইল না । যৌবনবতী চারুর সংসারে কোনো কাজ ছিল না । নিঃসঙ্গ ভাবে জীবন কাটাতে হচ্ছিল । যে সময়ে চারুর স্বামীকে খুব কাছে পাবার প্রয়োজন ছিল, সেই সময় কাছে পেল না । কারণ সে সময় খবরের কাগজই হয়ে উঠেছিল ভূপতির উপপত্নী । সত্যজিৎ রায় 'চারুলতা' সিনেমায় যাকে বলেছেন চারুর 'সতীন' । বাইরের জগৎ তাঁকে এমন

ভাবে অাচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে অন্তঃপুরে পত্নীর প্রতি একটা স্বাভাবিক উদাসীনতা আসে । ভূপতি ভেবেছিল বা বিশ্বাস ছিল বলা যায় যে স্ত্রীকে যখন খুশি পাওয়া যায় । স্ত্রীর প্রতি অধিকার অর্জন করতে হয় না । তাঁর বিশ্বাস ছিল -'স্ত্রী ধ্রুবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে— হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না ।' এই ভ্রান্ত বিশ্বাসেই তাঁর দাম্পত্যর নীড়ে ফাটল দেখা দিল । 'অধিকাংশ পুরুষ বিবাহ করে মাত্র স্ত্রীকে পায় না'- অজ্ঞ ভূপতি তাদেরই একজন । কীভাবে স্ত্রীর মন অধিকার করতে হয়, কী ভাবে ভালোবাসা জাগিয়ে রাখতে হয় তা সে জানত না । ফলে ধীরে ধীরে দাম্পত্য সম্পর্কের পারস্পরিক বন্ধনটা আলগা হয়ে আসে । —

"পারস্পরিক অন্তর সম্পর্কের ঐকতান গড়ে না ওঠে, তাহলে যতই সাতপাকে বাঁধা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠুক না কেন — সে সম্পর্কের মধ্যে ঠিকই একটা ফাটল রয়ে যায় ।"

দাম্পত্যর নীড় রচনায় যে পারস্পরিক অন্তর সম্পর্ক প্রয়োজন তা দানা বাঁধেনি । ফলে একটা ভয়ঙ্কর পরিণতি তার জন্য অপেক্ষা করছিল, তা সে উপলব্ধি করতে পারেনি । নিজের ভুলে নিজের অজান্তেই তা নষ্ট হয়ে গেছে । যৌবনবতী চারুও পারেনি কাগজের আবরণ ভেদ করে ভূপতিকে অধিকার করতে । যে সময় চারুর স্বামীকে নিয়ে দাম্পত্যলীলায় মাতামাতি করার সময় তা চারু পেল না । ভূপতির সময়ের অভাব ও অজ্ঞতায় মিষ্টি-মধুর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি । লেখক তাই বলেছেন- 'যে সময়ে স্বামী স্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চিরনূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত প্রত্যুষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না । নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত হইয়া গেল ।'

ভূপতি চারুর নিঃসঙ্গতাটা বুঝতে পেরেছিল । চারুর প্রতি যে উদাসীনতা দেখানো হচ্ছে সেটাও জানত । কিন্তু অজ্ঞ ভূপতি প্রতিকারের উপায় জানত না । সে ভেবেছিল মন্দার মতো কোনো স্ত্রীলোক এলে হয়তো চারুর নিসঙ্গতা দূর হবে । কিন্তু সে চারুর মনের অন্তঃস্থলের হদিশ পায়নি । কারণ তার জগৎ সংবাদ পত্রের অক্ষরেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল । চারুকে বার বার বলেছে সময় দিতে পারছিনা অন্যায় হচ্ছে, কিন্তু কোনো

প্রতিকারের উদ্যোগ নেয়নি । ফলে একটা দূরত্ব তৈরি হচ্ছে । ভূপতির নীড় দুই দিক থেকেই নষ্ট হচ্ছে, ঘরে-বাইরে । আসলে ভূপতির জীবনের সমস্যা হলো বিশ্বাস , মানুষকে অন্ধভাবে বিশ্বাস । উমাপতির বিশ্বাস ঘাতকতায় বাইরের নীড় ভেঙ্গে গেল । অন্তঃপুরে ফিরে এলো, বিশ্বাস ও শান্তির আশায় । লেখক তার কৃত কর্মের ফল দেখানোর জন্যই অন্তঃপুরে এনে দাঁড় করাচ্ছেন । এতদিন সে কর্মব্যস্ত জীবনে অন্তঃপুরে নিভৃতিচারিণীর সংবাদ সে রাখেনি । যখন বাইরের আঘাত পেয়ে সন্ধ্যার পাখির মতো নীড়ে ফিরে এলো । ভেবেছিল অন্তঃপুরে 'নিশ্চয় বিশ্বাসের স্থান আছে ।' একরাশ বিশ্বাস নিয়ে যখন নতুন করে নীড় বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে ফিরে আসছে- 'চারু তখন নিজের দুঃখে সন্ধ্যাদীপ নিবাইয়া জানালার কাছে অন্ধকারে বসিয়া ছিল' । চারুর হৃদয় শূন্য ভূপতির জন্য, সেখানে নীড় গড়ে তোলা সম্ভব নয় । চারু একবার নতুন করে চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি । নীরস ভূপতির সঙ্গে নীড় বাঁধা সম্ভব নয় । তখন চারুর নীড় অমলের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে গড়ে তোলা হয়ে গেছে । শুধু মাত্র দায়িত্ব কর্তব্য দিয়ে প্রেম হীন নীড় গড়ে তোলা সম্ভব নয় । চারু ভূপতির কাছে সংকুচিত হয়ে পড়তে লাগল । ভূপতির কাছে সে যেন অমাবস্যার মতো । ভূপতিও নীড় নতুন করে বাঁধার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না । নীড় বাঁধার মতো কোনো খড়কুটো পেল না । ভূপতি দেখল 'সহজ সুখ সহজ নহে' । যেদিন চারু গোপনে নিজের গহনা চাকরকে দিয়ে বন্ধক রেখে অমলকে টেলিগ্রাফ করার সংবাদ পেল । সেদিন ভূপতির কাছে সংসার 'বৃদ্ধ শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল' । তার বিশ্বাসের পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল । সেদিন টের পেল নীড় একবারে নষ্ট হয়ে গেছে । আর কোনোভাবেই জোড়া লাগানো যাবে না । তখন সে পালাতে চাইল মৈশুরে, আবার কোনো এক নীড়ের সন্ধানে । সখানে চারুকেও সঙ্গে নিতে চাইল না কারণ— "যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিতে সময় পাইব না? নির্জন বন্ধুহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গদান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব তখন নিস্তব্ধ শোকপরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কী ভয়ানক হইয়া উঠিবে ।"

এইভাবেই ভূপতির অবহেলা, উদাসীনতা, অজ্ঞতায় একটা দাম্পত্যের নীড় নষ্ট হয়ে

গেল ।

'নষ্টনীড়' তো আর শুধু নীড় নষ্টেরই আখ্যান নয়, নীড় নির্মাণের আখ্যানও । একদিকে যেমন ভূপতি-চারুর নীড় ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নষ্ট হচ্ছে তেমনি, অপরদিকে তেমনই অমল-চারুর নীড় নির্মাণও হচ্ছে । ভূপতির সদা ব্যস্ততায় যখন যৌবনবতী চারুর নিঃসঙ্গ জীবন কাটছে । যখন তাঁর মধ্যে একটা শূন্যতা তৈরি হচ্ছে, তখন সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য অমলের আগমন । অমলের সঙ্গে চারুর জীবন-যৌবন বিকশিত হতে লাগল । স্নেহের খড়কুটো দিয়ে একটা নতুন করে নীড়ের নির্মান শুরু হলো । যা স্নেহের দাবী মেটাতে গিয়ে একসময় প্রেমের অধিকার বোধ জন্ম নিল । ভূপতির রেখে যাওয়া অন্তঃপুরের একটুকরো জমিতে অর্থাৎ চারুর মনের কোণে আকাশ কুসুম কল্পনা দিয়ে বাগান বা নীড় গড়ে উঠতে লাগল । কেবল দুজনের আমড়াতলা কমিটি গড়ে উঠল, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ । এই বাগান তৈরির পরিকল্পনাটাও বেশ লক্ষ্যণীয়—কুঁড়ে ঘর, সেখানে হরিণের বাচ্ছা, ঝিল, ঝিলে হাঁস চরবে, বেশ ছোটো একটা ডিঙি, নীলপদ্ম আর সর্বোপরি একটা সাঁকো । যে সাঁকো দুটি হৃদয়ের যোগাযোগের সেতু, যেটা ভূপতির সঙ্গে ছিল না । শখের বাগান ছেড়ে আমড়া তলাতেই সাহিত্যের চাষ শুরু হলো । চারুর প্রেরণায় ও উৎসাহে অমলের সুপ্ত সত্তা বিকশিত হলো । চারু চাইত অমলের লেখা দুজনের মধ্যে গোপনে সীমাবদ্ধ থাক । অমল গোপন নীড় থেকে পাখা মেলে পত্রিকায় প্রকাশ করল । যে গোপনীয়তা ছিল তাদের প্রধান রস, তদের মাঝখানে এলো 'বাংলাদেশের পাঠকমণ্ডলী' । প্রেম জনিত অধিকার হারানোর ভয় চারুকে গ্রাস করল । সেই সঙ্গে আর এক বাধা ছিল মন্দা-'অমল চারুতে মুখোমুখি হইলেই মন্দা কোনো ছলে মাঝখানে আসিয়া ছায়া ফেলিয়া গ্রহণ লাগাইয়া দিত ।' অমলকে অধিকারের জন্যই চারু নিজে লিখতে শুরু করল । তাঁর লেখা অমলের থেকেও প্রশংসা পেল । অমলের যে প্রতিভার বিকাশ তা চারুর জন্য, আর চারুর নারীত্বে উত্তরণ অমলের জন্যই । চারুর নিঃসঙ্গ জীবনে অমলই এনে দিয়েছিল মুক্তির স্বাদ । —

"স্বামীসেবা ও সাংসারিক কর্তব্যে সে অবিচল—; তার লক্ষ্মী গৃহবধূর ইমেজ ভেঙে তার বাইরে আসা এক পরিপূর্ণ মানবী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অমলের ভূমিকা প্রধান । তার নারী

সত্তার সামগ্রিক বিকাশে অমলই ছিল প্রধান ও একমাত্র রূপকার । সংসারের কর্তব্যকার্য বন্দী চারুলতার কাছে অমল এনে দিয়েছিল মুক্তির আকাশ । এ যেন চারুর নবজন্ম । সেই সঙ্গে তার হৃদয়ে প্রেমেরও নবজাগরণ ।"

চারুর একদিকে প্রেমসত্ত্বা অপরদিকে পত্নীসত্ত্বা-এই দুই সত্ত্বাকে একসঙ্গে পাথেয় করে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল । কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি । অমল বিলেত চলে গিয়েছিল ভূপতি-চারুর নীড়টাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য । কিন্তু যে নীড় নষ্ট হয়ে গেছে তা তো নতুন করে আর গড়ে তোলা সম্ভব নয় । অমল চলে গেল ঠিকই কিন্তু যে নীড় সে নির্মাণ করে গেল, সেই প্রেমের নীড় চির অক্ষত থেকে গেল মনের এক নিভৃত কোণে । মনের মন্দিরে চারু অমলের মূর্তি নির্মাণ করে হৃদয়ের নৈবেদ্য দান করল । ভূপতি-চারুর দাম্পত্যর নীড় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু অমল-চারুর প্রেমের নীড় শাশ্বত হয়ে রইল । তাই নষ্টনীড় নীড় নষ্টের আখ্যান নয়, নীড় নির্মাণের আখ্যানও ।

৩.৪ অনুশীলনী

১) খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পে কাহিনি আলোচনা করে নামকরণ সার্থকতা বিচার কর।

২)খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পে লোকসংস্কৃতির আঙ্গিক কীভাবে ঘটোনাক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন আলোচনা কর।

৩) একরাত্রি গল্পের একরাত্রির প্রাসঙ্গিকতা গল্পের গতিকে কতখানি ব্যঞ্জনা প্রদান করেছে লেখ।

৪) নষ্টনীড় গল্পের নাম কেন নষ্টনীড় ব্যাখ্যা কর।

৩.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ (১-৪)খন্ড, বিশ্বভারতী।

মন্তব্য

২) নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ।

৩) তপোব্রত ঘোষ, রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ, দে'জ।

এককঃ-৪ গল্পগুচ্ছঃ-নির্বাচিত গল্প – হালদার গোষ্ঠী, স্ত্রীর পত্র

বিন্যাসক্রম

৪.১ হালদার গোষ্ঠী- গল্পের গভীরের কথা

৪.২ স্ত্রীর পত্র – গল্পের অন্তর্গত গভীরে

৪.৩ অনুশীলনী

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ হালদার গোষ্ঠী- গল্পের গভীরের কথা

প্রথাবদ্ধ মানুষের গতানুগতিক চিন্তাভাবনার বেড়াজালকে অতিক্রম করে আত্মানুসন্ধান প্রিয় ব্যক্তিমন যে ঠিক কবে থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামী নেশায় ঘর ছেড়েছিল, তা বলা ভীষণ কঠিন। কারণ সংকীর্ণ প্রথানুগ জীবনের বিপরীতে ব্যক্তির স্বাধীন মনের বিকাশ নির্দিষ্ট কোনো সাল তারিখের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়নি। কিন্তু যেহেতু আমরা আত্মান্বেষণ কিংবা ব্যক্তিমননের জাগরণ প্রসঙ্গে আধুনিক শিক্ষা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বৃহত্তর প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছি। তাই একথা বলা বোধহয় খুব একটা অসঙ্গত হবে না যে, উনিশ শতকের নবজাগরণ প্রথানুগত ভাবনার বিরুদ্ধে প্রথম বৃহত্তর আঘাত হানল! রেনেসাঁর বৃহত্তর প্রভাবে মানুষের অন্তরে সৃষ্ট হল অহম্ এর বিকাশ। তাছাড়া আমরা জানি, বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের ব্যক্তি চরিত্রের বদল ঘটায় যথেষ্ট সক্ষম হয়েছিল। আর তারই ফলস্বরূপ সামাজিকতার হাত ধরে শিল্প সাহিত্যও ঘর ছেড়েছিল নতুন পথের সন্ধানে।

হালদার গোষ্ঠী গল্পে কীভাবে সমষ্টিগত মতের বিপরীতে নবপথের সন্ধানে ব্যক্তিমন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে তাঁকে দেখানোও এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। হালদার গোষ্ঠী গল্পের প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যায় হালদারগোষ্ঠী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিপর্যয়ের অন্যতম ফসল। প্রচলিত জীবনযাত্রার বিপর্যয় কিংবা মানুষের মূল্যবোধের যে অবনমন মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত হয়, হালদারগোষ্ঠীর কথাবয়ানে তা যেন কিছুটা পূর্বগামিনী ছায়ার মতো প্রভাব ফেলেছে। আসলে এমনটা হওয়া বোধহয় স্বাভাবিক ছিল। কারণ যুদ্ধপূর্ববর্তীকালে পশ্চিমী চিত্রকলায় পোস্ট ইমপ্রেশনিস্টদের মৃন্ময়ী প্রবণতা এবং নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছিল। বদলে যাওয়া এই সময়কে চিহ্নিত করতে গিয়ে ডি এইচ লরেন্স তাই বলেছিলেন – "It was in 1915, that the old world ended."

একথা আমরা পূর্বেই বলেছি যে, প্রথাবদ্ধ মানুষের গতানুগতিক চিন্তাভাবনার বেড়াজালকে অতিক্রম করে আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তিমনের জাগরণ প্রথম বৃহত্তরভাবে সংঘটিত হয়েছিল আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে। এক্ষেত্রে উনিশ শতকের নবজাগরণ আধুনিক শিক্ষা দীক্ষার একটি জোয়ার রচনা করে প্রথানুগত সামাজিক ভিত্তির মূলে এক বৃহত্তর ভাঙন ধরিয়েছিল। বৃহত্তর এই সামাজিক অভিঘাত যেসব ব্যক্তিচরিত্রদের জন্ম দিয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই আলোর পথের দিশারী। প্রথাবদ্ধ নিয়মকে ভেঙ্গে ফেলার মধ্যে দিয়েই তারা যেন খুঁজে পায় বেঁচে থাকার স্বরূপ। বনোয়ারীলাল ও সেই সত্তারই উদ্ভূত প্রজ্ঞা।

জীবনযাত্রার স্থির যে পথে মিশে রয়েছে অনিমেষ শান্তি, সে পথের যাত্রী হতে যেন আর মন চায় না। নিশ্চিত গোষ্ঠী জীবনের বিপরীতে গিয়ে বনোয়ারী তাই পেতে চায় ব্যক্তিজীবনের স্বাদ। গোষ্ঠীর বিপরীতে বনোয়ারির এই পৃথক করেছে। ধনীর সন্তান হওয়ায় বংশকৌলীন্য, মানমর্যাদা, সুন্দরী স্ত্রী আর পাঁচজনের মতো তারও ছিল। কিন্তু জীবনানন্দের বোধ কবিতার বোধগ্রস্থ ব্যক্তিটির মতো বনোয়ারির অন্তরের বোধ তাকে অসুখী করে তোলে। সেখানে থেকে কিছুতেই মুক্তি নেই তার।

প্রথাবদ্ধ জীবনের কোনো কিছুতেই যেন বনোয়ারির শান্তি নেই। চিন্তাহীন যে জীবনকে বংশানুক্রমে মনোহরলাল কিংবা বংশী উপভোগ করে গেল সেই জীবনই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে । সব থেকে বিপদের কথা নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সে সচেতন। আর তাই "যোগ্যতা – এঞ্জিনের মতো তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে; সামনে যদি সে রাস্তা পায় তো ভালোই' যদি না পায় তবে যাহা পায় তাহাকে ধাক্কা মারে।"

আসলে হালদার পরিবারের বিষয়ভোগী গতানুগতিক জীবনের মধ্যে বনোয়ারি এক মূর্তিমান ব্যতিক্রম। স্ত্রী কিরণলেখাকে নিয়ে পরিবারতন্ত্রের বাইরে বেড়িয়ে সে রচনা করতে চায় নিজস্ব এক ভুবন। যার একমাত্র অধীশ্বর হবে সে। কিন্তু বনোয়ারির উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব কিংবা আত্মসচেতন মননের পাশে স্ত্রী কিরণলেখার চরিত্র ভীষণ ক্ষীণ।

"সবসুদ্ধ জড়াইয়া সে যেন বড়ো স্বল্প।" হালদারগোষ্ঠীর স্থির নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতি তার আস্থা অটুট। যে পরিবারের রীতি নীতি বনোয়ারির কাছে নির্জীব খাঁচায় পরিণত হয়েছে। কিরণের কাছে সেটাই যেন বেঁচে থাকার অদ্বিতীয় উপাদান। পরিবারতন্ত্র, একঘেয়ে জীবন কিংবা নীলকণ্ঠের ক্ষমতার কাছে পরাভূত হয়েও বনোয়ারির আস্থা ছিল কিরণের প্রতি। আর তাই বেঁচে থাকার নিভৃত কানন কিরণও যখন হালদারগোষ্ঠীর পাকা ভিতে নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন করল তখন 'ম্রিটেই বনোয়ারির বুকে সকলের চেয়ে বাজিল।'

বনোয়ারি ভাবল –

"এই হৃদয়কে আমি তো জাগাইতে পারি নাই। অথচ আমার যাহা সাধ্য তাহা তো করিয়াছি।"

কিরণ চরিত্রের এই সচেতন সৃষ্টি ত্যাগ গল্পের কুসুমকে মনে করায়। কিরণের মতো এত দীর্ঘ পরিসরে কুসুম বর্ণিত হয়নি ঠিকই। ইন্তু ভালোবাসার প্রতি সন্দেহ যেভাবে কুসুমকে চরিত্র হিসেবে হেমন্তের পাশে ম্লান করে রেখেছে। ঠিক সেভাবেই এই গল্পে কিরণের চরিত্র এবং মনের সংকীর্ণতা কিরণকে বনোয়ারির থেকে পৃথক করে দেয়। এই পৃথকীকরণ আসলে গল্পকারের একটি সচেতন প্রয়াস। কারণ প্রথাবদ্ধ গোষ্ঠী

জীবনের নিয়ম কানুনের প্রতিকূলে যার যাত্রা তাকে তো সমস্ত কিছু বিসর্জন দিতে হবেই। অর্থ-কীর্তি- স্বচ্ছলতার নিভৃত জীবন তো তার কাম্য নয়, পথই তার ঘর। আর তাই গোষ্ঠীজীবনের বিপরীতে গিয়ে সমাজ থেকে পরিবার থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন এক সত্তা শেষ পর্যন্ত 'চাকরি' খুঁজতে গৃহত্যাগ করল। সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীজীবনের চাকুরিজীবি শ্রেণি হিসেবে বনোয়ারির আত্মপ্রতিষ্ঠার এই বাসনা আসলে সমকালীন সময়ের ভাঙা গড়ার মুহূর্তকেই চিহ্নিত করে।

৪.২ স্ত্রীর পত্র – গল্পের অন্তর্গত গভীরে

স্ত্রীর পত্র এক নারীর লেখা পত্র, তার কাছের পুরুষটির উদ্দেশ্যে। হ্যাঁ খুব কাছের পুরুষ রূপেই চেয়েছিল পনেরো বছরের দাসতব জীবনে যুবতী মৃণাল। পুরুষটি পারেনি তার কাছের, প্রাণের মানুষ হয়ে উঠতে। তাই গল্পের নায়িকা মৃণাল হতে চেয়েছে বিছিন্ন, একাকী। রবীন্দ্রনাথের নারী বিষয়ক গল্পগুলির মধ্যে এক অন্য ধারার গল্প এই স্ত্রীর পত্র। গল্পটির ধরণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্যের স্মৃতি। গল্পের নায়িকা মৃণাল শুধু তার কথা বলেনি, এ যেন সমগ্র নারী জাতির হয়ে আপামর পুরুষ জাতির প্রতি তার বার্তা, বিদ্রোহ। এ পত্র শুধু সাতাশ নং মাখন বড়াল বাড়ির কর্তাকে নয়, সেই সব শোষকশ্রেণি ভিত্তিপ্রস্তরকে নাড়িয়ে দিয়েছে, যারা নারীদের অবহেলিত ভাবে।

আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়েও নারীকে নিয়ে আলাদা করে লিখতে বসতে হয়! আর কতদিন এরকম লেখালেখি চলবে ততদিন ভাবতে হবে এই পৃথিবীতে নারী তার প্রাপ্য সম্মানটুকু পায়নি। 'নারী সম্ভবত মহাজগতের আলোচিত প্রাণী' ভার্জিনিয়া উলফের এই কথাটি আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি নারীদের জন্য একটি আলাদা ঘর চেয়েছিলেন, যা কিনা জোটাতে পারেনি আমাদের ভব্য সমাজ। তাইওতো আজও শত শত মৃণালদের কলম ধরতে হয়। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত মানুষরূপে মানুষের সমকক্ষ রূপে আশ্রয় দিতে পারেনি আমাদের এই পৃথিবী।

‘বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী

অর্ধেক তার নর।’ - নজরুলের এই বাক্যবন্ধটি চিরসত্য রূপে মেনে না নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই।

পুরুষ নারীকে বন্দী করার জন্য তৈরি করেছে সমাজ, পরিবার, উদ্ভাবন করেছে ঈশ্বর লিখেছে একের পর এক ধর্মগ্রন্থ। হিন্দুপুরাণে চোখ রাখলে দেখতে পাবো দাসীর চেয়ে বেশি মর্যাদা নারীকে তারা দিতে চাননি। সেখানে আছে কঠোর দাসীত্ব। স্বামীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুগে যুগে মুনি ঋষিরা শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করেছেন। মনু (৫-১৫২) বলেছেন – বিয়েতে যে বাগদান করা হয়, তাতেই নারীর ওপর পতির স্বামিত্ব জন্মে; সুতরাং স্বামীর সেবা করা নারীর কতর্ব্য।

কোরানে আছে – “তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র; তাই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারো”

হামিদে আছে – পুরুষের পক্ষে নারী অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদের জিনিস আমি আমার পরে আর কিছু রাখিয়া যাইতেছি না। সতর্ক হও নারী জাতি সম্পর্কে। অকল্যাণ রহিয়াছে তিন জিনিসে নারী, বাসস্থান ও পশুতে। (এ নুর মোহাম্মদ [১৯৮৭, ১৮৭-২০১]); রফিক(১৯৭৯, ১৮১-১৮৩)

বাইবেলের একটি অনুশাসন এর দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাবো – ‘মনুষ্য আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে’[আদিপুস্তক ২-২৪]। আইনে এর তাৎপর্য হচ্ছে ‘ব্যবহারিক মৃত্যু’। আইনের ভাষায় সবামী-স্ত্রী এক ব্যক্তি; অর্থাৎ স্ত্রীর কোনো ভিন্ন সত্তা নেই। ধর্মের এই একটি মাত্র পন্থায় স্ত্রীর সমগ্র অস্তিত্ব হাওয়াই মিলিয়ে যাচ্ছে। আসলে এই সমস্ত ধর্মগ্রন্থগুলিই নারীর জন্য হাড়িকাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবিগুরু যথার্থই বলেছিলেন-

“ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো

এ আভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো”

স্ত্রীর পত্র গল্পের সমস্যা নিছক পণোপ্রথা নয়, স্বামীর বহুবিবাহ কিংবা অত্যাচার নয়, এ সমস্যা নারীর আত্মপরিচয়ের সমস্যা। দাম্পত্যের রচলিত ছক ভেঙ্গে এখানে ‘মেজোবউ’ –এর পরিবর্তে ‘মৃণাল’ পরিচয়েই জীবনের ভিন্ন অর্থ খোঁজার পালা শুরু হয়েছে। চারুলতা যা পারেনি, মৃণাল তা পেরেছে। মৃণাল বিংশ শতাব্দির মেয়ে। তীব্র এক অভাববোধ নিয়েও হাসিমুখে স্বামীর ঘর করেছে গত শতকের যেসব মেয়েরা, মৃণাল তাদের সহোদরা নয়। মনে হয়, বিত্তবান অভিজাত পরিবারের বধূদের প্রতিভূ হিসেবে চারুলতার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ প্রত্যাশা হতাশার সঙ্গে লেখকের যেন সম্যক পরিচয় ছিল। ঠাকুরবাড়ইর অন্দরমহলের মেয়েদের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন অন্তঃপুরের একটি বিশেষ দিক – স্বচ্ছলতার আড়ালে আত্মগোপন করে থাকা অনির্দিষ্ট এক অভাববোধ, নৈঃসঙ্গ – যা সেযুগের অনেকেরই নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। তবে ক্ষোভ যে জমা হচ্ছিল তারই অবচেতন প্রকাশ মূর্ত হয়ে উঠেছিল চারুলতায়। ‘নষ্টনীড়ে’র এই ছবিটি দেখে এসেই আমাদের পৌঁছানো অনেকটা সহজ হয়ে যায় ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পে। প্রসঙ্গত স্মরণিয়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জোড়াসাঁকোর বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে কবিপত্নী মৃণালিনীর বসবাসের ক্রমশ দুসহতার একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার ‘রবীন্দ্রজীবনী’র প্রথম খন্ড। জীবনীকার বলেছেন – “ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলন হইতে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ ফিরিলেন ১৩০৫ সালের জৈষ্ঠ মাসের শেষ দিকে। আসিয়াই কলিকাতা হইতে লিখিত পত্নী মৃণালিনী দেবীর পত্র পাইলেন। পত্র পড়িয়া বুঝিতে পারিলেন যে, স্ত্রীর পক্ষে জোড়াসাঁকোর একান্নবর্তী পরিবারের সার্ধ শতাধিক লোকমধ্যে বাস করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ পত্রে তাঁহাকে ধৈর্য অবলম্বন করিবারে সিদ্ধান্তে উপদেশ দিলেন ...”গোলাম মুরশিদ এই সূত্রটি শুধু উল্লেখই করেননি, তিনি একেবারে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন – “রবীন্দ্রনাথ নিজেই খুব বড়ো একটি যৌথ পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং একজন সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে তিনি নিশ্চয় উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই প্রথা ব্যক্তির ওপর কী অত্যাচার করে। এরূপ যৌথ পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং একজন

সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে তিনি নিশ্চয় উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই প্রথা ব্যক্তির ওপর কী অত্যাচার করে। এরূপ পরিবারে মহিলাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। ... তাঁর মৃত স্ত্রী যে - অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন 'স্ত্রী পত্র' গল্পটি লেখার সময় রঈন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সেকথা মনে করেছিলেন এবং সম্ভবত প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যেই একই সঙ্গে তাঁর পরিবার ও বাঙালি সমাজকে আক্রমণ করেছিলেন।" । এই প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই গল্পের উৎস কিনা এমন তর্কে না গিয়েও বলা যায়, সেকালের বাঙালি সমাজে মেয়েদের অসহায় দিনযাপন এবং প্রায়শ মৃত্যুর বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ যেন অনেকটাই দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষত নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর প্রমুখর রচনায় নারীপ্রগতির বিষয়টি তাঁকে নতুন করে ভাবিয়েছিলেন। শিশিরকুমার ঘোষের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি –" The protest in 'Strir Patra'(The Wife's Letter) was mare open and the voice of the New Woman, already heard in Europe, has its echo.") (Rabindranath Tagore, Sahitya Akademi, 1998, pg. 81) এইসব ভাবনার প্রেক্ষিতেই 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটির বিশিষ্টতা চিহ্নিত হয়ে যায়, 'মেয়েদের পক্ষ' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখনী এখানে যেন বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ফলে স্বভাবতই 'There was a howl from the reactionary camp'

পলাতকার মুক্তি কবিতায় মৃত্যপথযাত্রী মেয়েটি বলেছিল-

এ সংসারে এসেছিলেম

ন-বছরের মেয়ে

তারপরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে

দশের ইচ্ছা বোঝাই করা

এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে

পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।

ন'বছরের মেয়েটি দশজনের ইচ্ছের মূল্য দিতে দিতে পৌঁছেছে মৃত্যুর দোরগোড়ায়। বাইশ বছর ধরে সে জেনেছে 'রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা'। ভাঁড়ার ঘরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা তার জীবন, সেই দেওয়ালের বাইরে বৃহৎ বসুন্ধরা যে তার জন্য অপেক্ষামান, এমনটা তার জানাই ছিল না। মৃত্যুর আগে সেই পৃথিবীর স্পর্শ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল মেয়েটি – শিয়রের খোলা জানলা দিয়ে সেই বাহিরের খবর এসে পৌঁছল, তখন মনে হল –

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে

বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।

জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে

আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে –

আমি নারী, আমি মহীয়সী,

আমার সুরে সুরে বেঁধেছে জ্যোৎস্না – বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।

আমি নইলে মিথ্যা হতো সন্ধ্যাতারা –ওঠা

মিথ্যা হতো কাননে ফুল ফোটা।

দুর্গম পাড়াগাঁ থেকে কলকাতার সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের সম্পন্ন প[অরিবারের মেজোবউ হয়ে মৃণাল যখন এলো, তখন তার বয়স বারো। বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজোবউকে দিয়ে পূরণ করবার আত্যন্তিক ইচ্ছা ছিল মৃণালের শাশুড়ির। তাই এ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। মৃণালের রূপের শ্বশুরবাড়ির লোকজন বেশিদিন মনে রাখেনি, কিন্তু তার যে বুদ্ধি আছে একথা তাদের প[রতিপদে বুঝতে হয়েছে। মৃণালের দাম্পত্যের বয়স পনেরো। 'মুক্তি' কবিতার ঐ মেয়েটির মতো শুধু রাঁধা আর খাওয়ার পৌনঃপুনিকতার মৃণাল নিজেকে ফুরিয়ে দিতে চায়নি। 'দশের ইচ্ছা ওঝাই করা' জীবনও নয় তার। মৃণালের মেয়েটি ভূমিষ্ঠ হয়েই মারা উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথগাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইটকাঠের

বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়, তেমনই মৃণালের সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুইখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তার পর থেকে ফাটল শুরু হল।

মৃণালের বড়োজায়ের বোন বিন্দু যখন তার বিধবা মা-র মৃত্যুর পরে খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেতে তার দিদির কাছে আশ্রয় নিল, যেদিন বাড়ীশুদ্ধ লোক তাঁকে আপদ ভেবে যারপরনাই বিরক্ত হল এবং সেই বিরক্তির প্রকাশে স্বাভাবিক সৌজন্যের আড়ালটুকুও রাখল না। যে মৃণাল লিকিয়ে কবিতা লিখত, যে ভাবত ‘সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমি, সেই মৃণালের প্রসুপ্ত বাৎসল্য যেন এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে শতধারায় উৎসারিত হল। বিন্দুও এই পারিপার্শ্বিক বিমুখতার মধ্যে মৃণাল উপলব্ধি করল – ‘এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আজি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনদিন দেখিনি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।’

বাস্তবিক, বিন্দু মৃণালের এযাবৎ যাপিত জীবনে এক অভিজ্ঞতা। বিন্দুর ভালোবাসার দর্পণে মৃণাল এতইন পর আবিষ্কয়ার করল তার অস্তিত্বের স্বরূপ। বিন্দুর মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করে মৃণাল এতদিন পর আবিষ্কার করল বেঁচে থাকার অর্থ। কিন্তু বিন্দুর প্রতি মৃণালের এত আদর শ্বশুরবাড়ির লোকের অসহ্য হওয়ায় তারা কৌশলে এক নপাগলের সঙ্গে বিন্দুর বিবাহ দিল। বিন্দু একবার পালিয়ে এল মৃণালের কাছে, কিন্তু থানা পুলিশ আর বিন্দুর ভাসুরের চিৎকার তাঁকে আশ্রয় দিতে গিয়ে মৃণাল বিপন্ন হচ্ছে দেখে বিন্দু ফিরে গেল। শ্বশুরবাড়ি আরো অসহ্য হওয়ায় বিন্দু আবার পালাল তার খুড়তুতো ভাইদের কাছে। কিন্তু এবারও ব্যর্থ হল তার বাঁচবার আকুতি। বিন্দুর শাশুড়ি বলে সংসারে মন্দ স্বামীর তুলনায় তার ছেলে তো ‘সোনার চাঁদ’, সে তো আর বউকে ‘খেয়ে ফেলছিল না’। আর বিন্দুর দিদি বলে ‘...তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে।’ মনে রাখতে হবে, এগুলি শুধু সংলাপ নয়, সেকালের সমাজজীবনে অধিকাংশ হিন্দুনারীর অভিমত এইরকমই আর এইখানেই উচ্চকিত হয়ে উঠল মৃণালের বিদ্রুপতিক্ত কণ্ঠস্বর –

"কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে, সতীসাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল; জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচ বোধ হয়নি। সেইজন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেঁট হয়নি, বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেল কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিল না। ... তোমাদের এই সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না।"

এর মধ্যে মৃণালের খুড়শাশুড়ি শ্রীক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা মনস্থ করলে ঋণালও তার সঙ্গে যেতে চায়। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই ভেবে খুশি হয় যে, যাক্ বিন্দুর প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ এই সুযোগে হ্রাস পাবে। কিন্তু মৃণালের বুদ্ধি ভিন্ন হিসেব করেছিল। সে তার স্বদেশি করা ভাই শরৎকে ডেকে ভার দিয়েছে, যেমন করেই হোক বিন্দুকে পুরীতে যাবার গাড়িতে তাঁকে তলে দিতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে শরৎ খবর নিয়ে এল বিন্দু 'কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে।' রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে দিয়ে স্পর্শ করলেন সমকালীন একটি নিষ্ঠুর ও করুণ সত্যকে। পণ দেওয়ার অক্ষমতা থেকে পিতাকে রক্ষা করতে স্নেহলতার আত্মহত্যার বিষয়টিকে। দেশশুদ্ধ লোক চটে উঠল, 'মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাসান হয়েছে।' মৃণাল সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলল, এই নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ীর উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাংলি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।'

শ্রীক্ষেত্রে এসে মৃণাল চিঠি লিখছে তার স্বামীকে – "আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আহে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়। ।। আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দু দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।"

উল্লেখযোগ্য, সেকালের অধিকাংশ রচনায় পণপ্রথা – বাল্যবিবাহ – বহুবিবাহ – স্ত্রীশিক্ষা – অসবর্ণ বিবাহজনিত যে অসুখী দাম্পত্যের ছবি থাকত, 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণালের সমস্যা এসবের থেকে ছিল একেবারেই আলাদা। চিঠিতে সে স্পষ্টই জানিয়েছিল – "দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তো আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া পড়া অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোন দোষ নেই জাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। ... অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে - ... " তাহলে কী এমন বিষয় যা মৃণালের অন্তর্গত রক্তের ভিতর ক্রীড়াশীল হয়ে তাঁকে মেজোবউয়ের খোলস থেকে বাইরে নিয়ে এল? সংসারে অসহায় আশ্রয়প্রার্থী বিন্দুর অসম্মান সেই পরিবারের বধূ হয়ে মৃণাল মেনে নিতে পারেনি। সে লিখেছে, 'তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা ছিন্ন করে দিয়ে গেল।' আত্মঘাতী বিন্দু যেন মেজোবউ মৃণালের আচ্ছন্ন চৈতন্যকে জাগিয়ে দিল। আর সেই প্রবুদ্ধ চৈতন্যের আলোকে মৃণাল আবিষ্কার করল, নারীও পুরুষের মতোই বিধাতার হাতের আদরের পৃথিবীতে তার গৌরব রাখার জায়গা নেই। নিজের ব্যক্তিত্বের এই অপূর্ব মহিমার উপলব্ধিই মেজোবউকে সংসারের অভ্যস্থ সম্পর্কের হৃদয়হীন বন্ধন ছিন্ন করবার প্রেরণা দিয়েছে।" স্বামীর ঘরে নিতান্ত শোভাবৃদ্ধির জন্য পুতুল হয়ে থাকতে সে অস্বীকার করেছে। যে সংসারে তার মতামতের কোনো মূল্যই নেই একজন অসহায় স্নেহের পাত্রীকে পাগল স্বামীর হাত থেকে রক্ষা করবার কোনো শক্তিই যখন তার নেই, তখন সেই মিথ্যার সংসারে সে মিথ্যে হয়ে থাকবে কেন?

বিন্দুর ভালোবাসার আয়নায় নিজেকে আবিষ্কার করে মৃণাল যেমন নিজেকে চিনেছে, তেমনিই প্রকৃতির সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে অনুভব করেছে জীবনের আরো এরক সত্য। সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের বাড়িটার অন্দরমহলে কোথাও পেওয়োজনের অতিরিক্ত এক ছটাক জমি ছিল না। উত্তরের পাঁচিলের গাঁয়ে নর্দমার ধারে কোনো গতিকে জন্মানো একটা গাছ নতুন পাতা জন্মালে টের পাওয়া যেত ভুবনে বসন্ত

এসেছে। বৃহৎ বসুন্ধরায় ঋতুবুলের খবর নিয়ে আসত ঐ নতুন পাতাগুলি। কংক্রিটের এই শহরের গলির বদ্ধ বাড়িতে যেখানে স্বাভাবিক বৃদ্ধি কেবল বদ্ধ দরজায় মাথা কোটে – প্রকৃতির ঠেকিয়ে রাখা যে শ্বশুরবাড়ি মৃণালের স্বাভাবিক মানবপ্রক্রিতির স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারকেও বন্ধ করতে চায়, সেখানে দাঁড়িয়ে ইন্দুর মধ্যে দিয়ে মেজোবউ অনুভব করল হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে – আর এই ভাবনার সেই বিরাট পৃথিবীর সঙ্গে জোগ হয়ে গেল তার, মৃত্যুর বাশিতে বেজে উঠল জীবনের সুর – ‘কোথায় রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরা আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া; কোন্ দুখে কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দি করে রেখে দিতে পারে! ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর! মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না।’

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আম্র মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।‘

না, ছোটবেলার সান্নিপাতিক কিংবা প্রসবজনিত ব্যধি, কোনোটাই যখন মৃণালকে মরতে দেয়নি, এখনও সে বাঁচবার জন্য মরবে না। বরং মীরাবাঈ – এর শরণ নেয় সে।

বলে – ‘এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা। বলে ‘আমি বাঁচব। আমি বাঁচলুম।’

৪.৩ অনুশীলনী

১) হালদার গোষ্ঠী ও স্ত্রীর পত্র গল্পের নিরিখে সবুজপত্রে রবীন্দ্র অভিক্ষেপ ব্যাখ্যা কর।

২) হালদার গোষ্ঠী গল্পে বনয়ারীলালের স্বাধীনচেতা মনোভাব ঘটনাপরম্পরার নিরিখে বিশ্লেষণ কর।

৩) স্ত্রীর পত্র গল্পে মৃণাল চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা ও নারী শক্তির জাগরণে কতটা অগ্রগামিনী লেখ।

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ (১-৪)খন্ড, বিশ্বভারতী।

২) নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ।

৩) তপোব্রত ঘোষ, রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ, দে'জ।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অশীতিপর জীবনের বিচিত্র সাহিত্যসৃজনের ও নির্মাণের একাধিক ভাবপর্যায়ে তৈরি করেছেন নানবিধ পরম্পরাগত সমন্বয় ও অভিমুখ। সেই বিচিত্রমুখী ভাবপর্যায়ের সাধারণ, প্রচলিত অর্থ হয়তো দৈনন্দিন জীবনে আছে একভাবে, কিন্তু সেইসব অতি সাধারণ ভাবপারম্পর্য রবীন্দ্রমানসলোকে কী ব্যপক সুগভীর তাৎপর্যকে তুলে ধরেছে তা রবীন্দ্রভাবলোকের নিবিড় পরিচয় ব্যতিরেখ অসম্ভব।রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়কর প্রতিভা। সীমায়িত জীবন পরিসরের মধ্যেই তিনি সর্বকালীন সাহিত্যসৃজনের ছায়াপাত ঘটিয়েছেন তার নির্মিত দক্ষতায়। সর্বদেশ ও সর্বজাতির মিলন ঐক্যকে এক পরিশীলিত ভাবধারায় গ্রথিত করার যে দার্শনিক পন্থা তা একমাত্র রবীন্দ্রচিন্তার অনুষঙ্গেই উঠে আসা সম্ভব। এখানেই তিনি আমাদের অহংকার, অস্তিত্ব ও প্রেরণার মাত্রা উদ্বোধিত করে তোলেন। সাহিত্যের নবীনতম রূপায়ণ ছোটগল্পের যাত্রাপথ তারই হাতে আরম্ভ হয়। শুধুমাত্র বাংলা ছোটগল্পের ধারাবাহিকতার সূত্রপাতই নয়, বাংলা ছোটগল্পের লক্ষণ কেমন হতে পারে তারও সঠিক দিক্ নির্দেশন করেন। ছোটগল্পের উপযোগী ভাষা, চিন্তন, রস তাৎপর্য কোন স্তরে স্থাপন করলে তা সার্থক হতে পারে, তারও দিক্ উদ্‌ঘাটন রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞায়।রবীন্দ্র সাহিত্যে ছোটগল্পের বিলম্বিত আবির্ভাব এইটুকু প্রমাণ করে যে, এই নতুন ধরনের শিল্পরূপ উদ্ভাবন করতে রবীন্দ্রনাথকে পল্লীজীবনের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ ও তাঁর বিচিত্র রস আস্বাদনের অনুকূল অবসরের প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল। তিনি কল্পনার অন্তরাল থেকে কবি দৃষ্টির রোমান্টিক অনুরঞ্জনের মাধ্যমে, পলবঘন প্রগাঢ় শান্তির পটভূমিকায়, নদীর অন্তহীন

বিস্তার ও অসীমের অভিমুখী প্রাণচাঞ্চল্যের সঙ্গে এই সঙ্গীন জীবনযাত্রার নিগূঢ় সত্তাটিকে অনুভব করেছেন ও এর প্রতিবেশের অন্তর্নিহিত জীবনরূপকেও সুমিত কারুকার্যের ধরণে তুলে ধরেছেন। গদ্যের আঙ্গিকে ছোটগল্পের ধরণকে, রূপকে তুলে এনেছেন।

এককঃ-৫ প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাংলা ছোটগল্প

বিন্যাসক্রম

৫.১ প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাংলা ছোটগল্প

৫.২ মধ্যবিত্তের সংকট ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প

৫.৩ তেলেনাপোতা আবিষ্কার গল্প আলোচনা

৫.৪ অনুশীলনী

৫.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাংলা ছোটগল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোলের ভাবধারার লেখক হলেও কল্লোলের আগে প্রবাসী পত্রিকার নিয়মিত তিনি লিখতেন, কল্লোল ছেড়ে তিনি কালিকলম পত্রিকায় সম্পাদনা ও লেখার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি একাধারে কবি, বিজ্ঞানী ও গল্পকার। ফলে তার গল্পে কবির কবিত্ব, বিজ্ঞানীর নিরাসক্তি ও গল্পকারের সহমর্মিতাবোধ যুক্ত হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধায় তাঁর 'বাংলা গল্প বিচিত্র'য় প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "যে কালভূমিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিকাশ, তাঁর কবি-মানস ও জীবন-প্রতীতির অনিশ্চয়তা সেই ভূমিরই শস্য। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবাদী বিকৃতি ও ক্ষোভে জর্জরিত, জ্বালায় তাঁর অন্ত নেই – এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্তি তাঁর স্বতঃই কাম্য; কিন্তু সেই বাঞ্ছিত মুক্তি কোন্ পথ দিয়ে আবির্ভূত হবে তাঁর সন্ধান সে তখনো পায়নি। ... তাই তাঁর মধ্যে একাধারে সংগ্রামী ও পলাতক বিজ্ঞানমানস এবং আদিমতা-সংসোক্তি; তাই মায়াকোভ্স্কির নাগরিকতা আর রুশোর অরণ্যপ্রীতি, তাঁর কাছে সমার্থক।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর নিজের শিল্পীসত্তা সম্বন্ধে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "দুঃখও দেখেছি বটে, দেখছি কদর্যতা। মার চোখের জল দেখেছি, গলিত কুষ্ঠ দেখেছি, দেখেছি লোভের নিষ্ঠুরতা, অপমানিতের ভীরুতা, লালসার জঘন্য বীভৎসতা, নারীর ব্যভিচার, মানুষের হিংসা, কদাকার অহংকার, উন্মাদ বিকলাঙ্গ রুগ্ন গলিত শব। তবু -"

"...এ দেখেও আবার যখন শান্ত সন্ধ্যায় ঝাপসা নদীর ওপর দিয়ে মন্থর না'খানি যেতে দেখি স্বপ্নের মতো পাল তুলে যখন দেখি পথের কোল পর্যন্ত তরুণ নির্ভয় ঘাসের মঞ্জি এগিয়ে এসেছে, দুপুরে অলস প্রহরে সামনের মাঠটুকুতে শালিকের চলাফেরা দেখি, তখন বিশ্বাস হয় না আমার মত না নিয়ে আমায় এই দুঃখভরা জগতে আনা তার নিষ্ঠুরতা হয়েছে।"

ছোটগল্পকার হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের খ্যাতি সর্বাধিক। তবে তাঁর দুএকটি উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। 'সূর্য কাঁদলে সোনা' উপন্যাস অত্যন্ত জনপ্রিয়। পাঁক উপন্যাসও অত্যন্ত সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পসংগ্রহগুলি হল – বেনামী বন্দর(১৯৩০), পুতুল ও প্রতিমা(১৯৩১), অফুরন্ত(১৯৩২), পঞ্চশর(১৯৩৪), মৃত্তিকা (১৯৩৫), মহানগর (১৯৩৭), ধূলিধূসর(১৯৩৮), কুড়িয়ে ছড়িয়ে (১৯৪০), সামনে চড়াই (১৯৫০), সপ্তপদী (১৯৫৩), জলপায়রা (১৯৫৭), প্রেমই ধন্বন্তরি(১৯৫৮), নানা রঙের বোনা (১৯৬০) ইত্যাদি।

তাঁর প্রথম যুগের একটি কবিতায় মানুষ ও জীবন সম্পর্কে একটি মৌলিক জিজ্ঞাসার আর্তি ফুটে উঠেছিল –

' রক্ত, মাংস, হাড়, মেদমজ্জা,

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসাসমেত –

গোটা মানুষের মানে চাই। '

তিনি মানবজীবনের রহস্য উন্মোচনে মানুষের স্থূল ও আপাত কুৎসিত প্রবৃত্তির মধ্যে প্রবেশ করে সন্ধান করেছেন জীবনের অর্থ। মানুষের মনের অরণ্য রহস্য বিভীষীকায়

আসল অরণ্যকেও ছাড়িয়ে যায় – বুঝেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, প্রেম সম্পর্কে এক অদ্ভূত কাপুরুষতাকে এখানে দেখানো হয়েছে। দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের দুর্বল মুহূর্তে প্রেমের অমৃতভান্ডটি স্খলিত হয়ে পড়েছে মানুষের মুষ্টি থেকে।

৫.২ মধ্যবিত্তের সংকট ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিরলস ছয় দশকের বেশি সাহিত্যসৃজনের প্রয়াস সাহিত্যবোদ্ধা ও অনুরাগী পাঠকুলের নিবিড় সান্নিধ্য এনে দিয়েছে। একেবারে সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত দৈনিক রুজি রোজগার ও বেঁচে থাকার চৌহদ্দিটাকে একটু দেখলেই আমরা আবিষ্কার করি তার অসংখ্য গল্প, কবিতা, উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের তার বাড়ির কাছ দিয়ে অনাদিকাল ধরে চারপাশে আদি গঙ্গার বহমান স্রোতস্বিনীর ছবির পাশে মাছ ব্যবসায়ীদের আনাগোনা, ঘুপচি গলির চারপাশে রাস্তার বাঁদিকে ডানদিকে ইট, চুন সুরকির দোকান, বিক্ষিপ্ত ঠেলাগাড়ির জটলার পাশ দিয়ে ব্যবসায়িক মানুষের জীবনযাপনের ছায়াচিত্র জীবনশিল্পীর চোখে ধরা থাকতো। আর সেই ছায়াচিত্র দেখেই মূর্ত হয়ে উঠতো তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাসজীবনের ভৌগোলিক বিবরণটি পেলেই তাঁর অসংখ্য রচনার প্রেক্ষাপট খুব সহজেই উঠে আসে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলার মধ্যবিত্ত জীবনের অস্তিত্ব সংকট থেকে উঠে এসেছে। যার প্রেক্ষাপট ছিল তাঁর অতি পরিচিত শহর কলকাতার রুগ্ন ভগ্নদশাগ্রস্ত চেহারা। ফলত তাঁর প্রতিটি গল্পের মেজাজ এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু আমাদের মুহূর্মুহূ নাড়া দিয়েছে তীব্র যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত করেছে। “শুধু কেরানী” গল্প এমনই এক সংকটকে কেন্দ্রভূত করে পরিবেশিত হয়েছে। কেরানীর ভ্রোজগারে সত্যিই সংসার চলে না। তবুও ছুটির দিনে মাঝে মধ্যে একটু আনন্দ খেলে যায় তাদের জীবনে। একদিন ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে হেঁটে এসে রাস্তার মোড়ে মালা কেনে স্ত্রীর জন্য, যদিও এও স্ত্রী কাছে বাহুল্য মনে হয়। কেননা মধ্যবিত্তের স্বপ্ন থাকলেও অর্থের সংকট তাদের আশা পূরণ করতে দেয় না। এর মধ্যেই স্ত্রীর সূতিকা জ্বর হয়, হয়তো ভাল চিকিৎসা সারিয়ে তলতে পারত, বাপের বাড়ি যাবার কথা বললেও মেয়েটি সে

কথা কানে তোলেনি, শেষে অবস্থা এতটাই শোচনীয় আকার ধারণ করে যে কোন রকম গত্যন্তর থাকে না সেরে উঠবার। মধ্যবিত্তের অর্থ সংকটের মর্মান্তিকতাকে উল্লেখ করে লেখক বলেছেন – 'কোনো সময় হয়তো একবারটি মনে হয় যদি সে এমন গরীব না হত, আরো ভালো করে ডাক্তার দেখিয়ে আর একটু চেষ্টা করে দেখত।'

তাঁর অন্যনান্য গল্পেও দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে কীভাবে নানবিধ বিচিত্র বিষোয়ো প্রবেশ করে গল্পের ও ঘটোনার সংকট ও আলোড়োন কে প্রভাবিত করেছে তাই দেখার।

৫.৩ তেলেনাপোতা আবিষ্কার গল্প আলোচনা

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্প মধ্যবিত্তের পরিসরে লেখা গল্প যার আরম্ভ ও সমাপ্তির মধ্যে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, মধ্যবিত্ত অসুস্থ চিন্তা এবং কিছুটা মনোবিকলনের রূপ পেয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র এখানে নিরাবেগ নির্মম অভ্রান্ত চরিত্র বিশ্লেষক। আমাদের অনেক শুভ ইচ্ছা কিভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়, কথা রাখা যায় না, ভালোবাসার অঙ্গীকার অস্বীকৃত হয় – তারই অসামান্য গল্পরূপ 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'।

কলকাতার যুবক যদি কোন একদিন অদূরবর্তী অথচ সম্পূর্ণ অচেনা তেলেনাপোতা গ্রামে বাস ও গোরুরগাড়িতে বহু ক্লেশ সহ্য ক্রে পৌঁছয় তবে তাঁর মনে হয় "এলেম নতুন দেশে"। সেখানে সহযাত্রী বন্ধুর আত্মীয় বাড়ি এক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এসে ওঠে মনে হবে জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোনো এক অজানা স্থানে। সেখানে উদ্‌ঘাটিত হবে এক দৃশ্য- বিষাদে-মাধুর্যে ভরা, এক অন্ধ মৃত্যুপথযাত্রিণির বিশ্বাস। কোন এক নিরঞ্জন তাঁর মেয়ে যামিনীকে বিবাহের আশ্বাস দিয়েছিল বুঝি বা সেই ফিরে এল। তখন মানবিকতার খাতিরে বা হঠাৎ আবেগে যামিনীর প্রতি নব অনুরাগে কলকাতার যুবক হয়তো সেই বৃদ্ধাকে কথা দেবে – যামিনীর ভার নেবে বলে। বৃদ্ধার একরাশ আশীর্বাদ আর যামিনীর শারদগুভ্র মেঘের মতো একফালি কৃতজ্ঞতা নিয়ে সে আবার বিভিন্ন যান ডিঙিয়ে ফিরে আসবে এই সব ভোলানোর মহানগরে, আবার তেলেনাপোতা ফিরে যাবার সংকল্প নিয়ে। তারপর দিন হঠাৎ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত

হয়ে শুয়ে পড়বে। বহুদিন পরে আবার সেরে উঠে মনে হবে "তেলেনাপোতা বলে কোথাও সত্যি কিছু নেই। আসলে এ কেবল তেলেনাপোতা আবিষ্কার নয়, এ হল মধ্যবিত্ত মানসের অসুস্থ স্বপ্নের ও অবক্ষয়িত মূল্যবোধের রূপায়ণ।"

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের যামিনী নামের মেয়েটির কথা মনে করা যাক। মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যথা বেদনা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ছায়া যামিনীর শরীরে পূর্ণ প্রতিভাত। অথচ সে যেন রক্তমাংসের রমণী নয়। সে যেন চেনা পৃথিবীর বাইরে এক অনুভূতিহীন গ্রহান্তরে বাস করে। অদ্ভুতভাবে এক সুররিয়ালিস্টিক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এ গল্পতে। এ গল্পে কোথাও মহাযুদ্ধের কোথাও মহাযুদ্ধের ছায়াপাত নেই, কোলাহল নেই, ভাবালুতা নেই অথচ গল্পটি হঠাৎ যেন কোথায় মাটিকে স্পর্শ করেছে। তেলেনাপোতা আবিষ্কার গল্প কোনো তেলেনাপোতা স্মৃতি নয়, স্বপ্ন নয়, বাস্তব নয়। গল্পের স্টেটমেন্টধর্মী কথনভঙ্গিমা গল্পটইকে একটা ঋজুতা দিয়েছে। এমন যত্নের সঙ্গে গল্প শরীর নির্মাণ করা সে যুগে দুর্লভ ছিল। 'মতো' শব্দটির মতো প্রতারক শব্দ আর বেশি নেই। তবুও প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পে অজস্র 'মতো' ব্যবহার করেছেন – যা গল্পটিকে মহিমা দিয়েছে। দিয়েছে একমুখীনতা। গল্পের পটভূমি এই ভাবে আরম্ভ হয়েছে –

"পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়বিদ্ধ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। আর জীবনে কখনও কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে, তা হলে একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।"

কোন এক সন্ধনা গল্পের অভ্যন্তরের বয়ানকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কবি যেন চেতনা থেকে চেতনান্তরে গল্পধর্মী বয়ানের ভিতর দিএ মনের গহন গভীরে পাড়ি দিয়েছেন কোন এক রহস্যময় দুর্ভেদ্য জিজ্ঞাসাকে খুঁজে বের করার জন্য। তাই 'প্রতি মুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারের দেয়ালে বুঝি অভেদ্য কিন্তু তবু গোরুর গাড়িটী অবিচলিতভাবে ধীরে মন্থর গতিতে এগিয়ে যাবে, পায়ে পায়ে পথ যেন ছড়িয়ে ছড়িয়ে।'

গল্পে বার বার অতীতের দিকে ফিরে যাবার কথা কথা বলা হয়েছে, যেখানে জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে এক রকম কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পৌঁছেছেন, মনে হবে যেন এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদবুদ ক্ষিকের জন্য জীবনের জগতের ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে। আপনি যেন গল্পের ঘটনার মধ্যে অবচেতনে কারোর একটা ইশারায় কাজ গুলিকে একটার পর একটা করে চলবেন, আপনার সক্রিয় সদিচ্ছা না থাকলেও কাজ গুলইকে আপনাকে করতে হবে। ভবিষ্যতের ঘটনা যেমন করে হুবহু মিলে যায় তেমনি আপনার সঙ্গে হওয়া ঘটনাগুলিও যেন তেমনই কোনো পূর্বনির্ধারিত ঘটনাপরম্পরার অংশ। একটি অংশ - ‘একটু অপ্রস্তুতভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে একবার তাকাতেই হবে। সেও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীর পদে ঘাট ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরবার চকিত মুহূর্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত করুণ মুখে খেলে গেছে।’

মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে পৌঁছে আর তেলেনাপোতার স্মৃতি মনে থাকবে না। আসলে গল্পের ভিতর দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে জীবনে মানুষ যখন কালের স্রোতে এগিয়ে যায়, পিছনের স্মৃতি সে আর মনে রাখে না, কিন্তু সেই স্মৃতি যদি কোন ব্যথাতুর প্রত্যাখ্যান অস্বীকারের পরম্পরার কালো ইতিহাসে আচ্ছন্ন থাকে, যদি কোন অপসারণের, অপনোদনের মর্মাতুর কালো অভিজ্ঞতা আপনাকে ভবিষয়তে এসে দরজায় কড়া নাড়ে তখন আপনি কি এমনই শান্ত নির্বিঘ্ন থাকতে পারবেন। হয়তো না। সেই হয়তো বিশ্লেষণ নিয়েই তেলেনাপোতার গল্প, চিরন্তন রাত্রির অতলতায় যে বুদ্‌বুদ এমন ভাবেই হারিয়ে যায়, নিমগ্ন হয়ে যায়।

মধ্যবিত্তের বিপর্যয় মূল্যবোধের বর্ণোনায় হয়তো, শৃঙ্খল, স্টোভ প্রভৃতি গল্প উলেখযোগ্য। মধ্যবিত্তের ঘৃণ্য অবিশ্বাস ো সংশয়ের দুশ্চেচ্ছ্য জটিলতা কীভাবে বিষময় করে তুলেছে তার পরিচয়স্থল হয়তো গল্পটি। মহিম অদ্ভুত বিকৃতস্বভাবী পুরুষ। জীর্ণ সাতমহলা বাড়ির দু’খানি ঘরে লাবণ্যের দাম্পত্য জীবনের সূত্রপাত। সাতপুরুষ ধরে এ বাড়ির পুরুষেরা মেয়ানুষদের চরম লাঞ্ছনা ও অপমান করেছে, তার পাপে এ বাড়ি বিষাক্ত, পুরুষরা অভিশপ্ত। দুর্যোগের রাতে লাবণ্য কে নিয়ে যায় বাড়ী থেকে দূরে ছোট্ট

নদীর পোলের উপর দিয়ে যাবার সময় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, কিন্তু পরবার সময় লোহার বল্টুতে কাপড়ের আচল আকটে সে বেঁচে যায়। মহীমের মধ্যবিত্ত সত্তা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। এক অংশ বলে তুমি জান না লাবণ্য কত বাঁধা রক্তের ভিতরে কত বিষ জমে আছে। কিন্তু এ বিষ থেকে আমি মুক্ত হবই, শুধু যদি তোমার ভালোবাসা পাই। ওপর অংশ লাবণ্য ফেলে দেবার আগে ভাবে – কি বিশ্বাস নারীকে করা যায় কি তাদের প্রেমের মূল্য? এখানেই মধ্যবিত্তের দ্বিধা বিভক্ত বিপর্যস্ত মূল্যবোধ কাজ করছে।

গল্পলেখার গল্পতে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন যাঁদের কথা কেউ লেখে না, যাঁদের জীবনে চোখ ধাঁধানোর ছড়াছড়ি নেই, তাদের কথা লিখবার একটা তাগিদ এ গল্পের অনেক আগেই আমার মনের মধ্যে কোথায় যেন ছিল। হতভাগ্য নগণ্য বঞ্চিত মানুষের জন্য তার শিল্পীসত্তার অন্তর্গূঢ় সমবেদনা ফুটে উঠেছে তার গল্পে। যুগ পরিবেশের বিপর্যস্ত মূল্যবোধ প্রসঙ্গে সংশয় হতাশায় দীর্ণ বর্তমান জীবনের তাৎপর্য অন্বেষণ করেছিলেন তিনি। যে জীবন ইজ্ঞাসার উত্তর তিনি খুজেছিলেন তা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন আপেক্ষিক ভাবে নিম্নমধ্যবিত্তের মানসিকতায়। অখন্ড মানুষের মর্ম যিনি অনুসন্ধান করেছেন তিনিওই তো সবচেয়ে স্পষ্ট করে বুঝেছেন ভাঙাচোরা মানুষের চেহারা ভঙ্গুর হতভাগ্য মানুষের মসীবর্ণ ছবি দেখেছেন বলেই জীবনের রহস্য সন্ধানে তিনি এত ব্যকুল আর হতভাগ্য নগণ্য বঞ্চিত মানুষের জন্য তার শিল্পী সত্তার অন্তগূঢ় সমবেদনা।

নিম্ন মধ্যবিত্তজীবনের নিরুপায় ব্যর্থতা ও আদর্শচুত্যি প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম পর্বের গল্পে রয়েছে। শুধু কেরানি ভবিষ্যতের ভার এবং পুন্নাম এর প্রধান তিনটি গল্প। শুধু কেরানি গল্পে নেই স্থান বা পাত্রপাত্রীর নাম। নেই দরিদ্র কেরানি জীবনের প্রাত্যহিক খুঁড়িয়ে চলার চিত্রকল্প। কেবল আছে ব্যর্থতা, নৈরাশ্য পরাজয়ের সংযত কাহিনি। এর সদ্য বিবাহিতা কেরানির সম্পত্তির ছোটখাটো স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা কীভাবে দারিদ্র্যের জন্য সম্ভব হল না এ তারই সংযত শিল্পরূপ। লেখক এই গল্প লিখতে গিয়ে উচ্ছসিত হন নি। বেদনায় অশ্রু বিহ্বল হন নি, নিজেকে গল্পের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করেননি। কিন্তু অনুভব করা যায় এই ভঙ্গুর পৃথিবীর সাধারণ নগণ্য মানুষের এই ভাঙাচোরা জীবনের অসহায়তার প্রতি তার কী গভীর মমত্ববোধ। সেই কেরানীর ছেলেটি ট্রামের

পয়সা বাঁচিয়ে গোড়ের মালা কেনে। অথচ এই অর্থমূল্য হিসেবের দিক থেকে অনেক। রূঢ় বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে না কেউ। তবু ভালোবাসার মধ্যে তো কোনো ফাঁকি ছিল না কেরানির। তারপর পরস্পর প্রেমিক যুগল পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কি করুণ মর্মান্তিক অভিনয় করে। সূতীকা রোগাক্রান্ত বধূটি ধীরে ধীরে নিভে যেতে থাকে। তা দুজনেই বোঝে, দুজনেই ছলনা করে। মেয়েটি যখন বলে, তুমি ভেবে ভেবে মন খারাপ করো না। আমি ঠিক সেরে উঠব। তখন ছেলেটি বলে কই আমি ভাবি নে ত! সেরে ঊথবে না তো কী, নিশ্চয় উঠবে। কোন সময় তরুণ স্বামীর মনে হয়, সে যদি এমন গবীর না হতো, আরো ভালো করে ডাক্তার দেখিয়ে আর একটু চেষ্টা করে দেখতো।

তবু তারা বিদ্রোহ করে না সৃষ্টির বিরুদ্ধে। নির্দোষের উপর এই অন্যায় অবিচারে বিধাতার পক্ষপাতিত্বে ক্ষিপ্ত হয়ে অভিশাপ দেয় না সংসারকে। মানুষের কাছে তারা মাথা নীচু করে চলে, বিধাতার কাছেও মিথ্যা ছলনা অবলম্বন করে তারা বেঁচে থাকতে চাই।

শুধু সেদিন জ্ঞান হারাবার আগে মেয়েটি একটি বারের জন্যে এত দিন কার মিথ্যা করুণ ছলনা ভেঙ্গে দিয়ে কেঁদে ফেলে দিয়ে বললে আমি মরতে চাইনি, ভগবানের কাছে রাত দিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি – কিন্তু সব ফুরিয়ে গেল। তখন কাল বৈশাখীর উন্মত্ত মসীবরণ আকাশে নীড় ভাঙ্গার মহোৎসব লেগেছে। নির্মম নিয়তি দুটি অসহায় মানুষের প্রার্থনাকে অগ্রাহ্য করল আর লেখক তাই তাদের প্রতি দেখালেন গভীর মর্মবেদনা।

হয়তো – গভীর দুর্যোগের রাত্রিতে একটি একটি আশ্চর্য ঘটনা লেখকের মনে জাগিয়ে তুলেছিল একরাশ হয়তো'র প্রশ্ন। নির্জন পথে চলতে চলতে একটি অর্ধসমাপ্ত সেতু পার হতে হবে, সামনে দেখতে পেলেন একটি নরনারী কেরোসিনের বাতি হাতে দুর্গম সেতু পার হাবার চেষ্টা করছে, মেয়েটি আসতে চাইছে না। পুরুষটি তার হাত ধরে পোলের অন্য প্রাপ্ত থেকে সেতু পার হচ্ছে। এমন সময় লেখক শুনতে পেলেন মেয়েটির চিৎকার। পোলের ধারে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেছে। এতক্ষণে

হয়তো স্রোতের টানে ভেসে গেহে। সাঁতার জানলেও এই স্রোতে রাত্রিতে উদ্ধার করা মুশকিল। হঠাৎ অনেক নীচ থেকে অস্পষ্ট কাতর আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল, পরমুহূর্তে তার শাড়ির প্রান্ত টুকু চোখে পড়ল। মেয়েটিকে উদ্ধার করে যখন ফিরছেন তখন দম্পতির যে অস্পষ্ট অথচ ভয়ঙ্কর কথা শোনেন তাতেই লেখক বিস্ময়চকিত হয়ে যান – "মেয়েটি পুরুষের সহিত চলিয়া জাইতে জাইতে বলিতেছিল – কী আশ্চর্য দেখো, প'ড়ে যাবার সময় আমার যেন মনে হল তুমি আমায় ঠেলে দিলে। পা ফসকে তো পড়িনি, আমার যেন ঠিক মনে হল তুমি ঠেলে দিলে..." এই কথা ও ঘটনার প্রেক্ষিতেই লেখকের মনে আপনা থেকেই একটি কাহিনি গড়ে ওঠে – যেখানে এক প্রকান্ড সাত মহলা দালান। চারিধারে নোনা ধরা স্তূপ। বাইরে থেকে দেখলে ভুতুরে পোড়াবাড়ি বলে মনে হয়। জড়াজীর্ণ বাড়িটির কোনো গোপন কক্ষে এখনো মুমূর্ষু প্রাণ ধুকধুক করে যেন জ্বলছে। এই ধ্বংসাবশেষের অন্তরাল থেকে কোথায় মানুষের জীবনের ধারা বয়ে চলছে তার সন্ধান পাওয়া নিশ্চিত নয়। রাত্রে দেখা যায়, ধ্বংসস্তূপের মাঝখান থেকে ক্ষীণ আলোকরেখা আসছে। এমনই এক বাড়িতে বিয়ে হয়ে আসে লাবণ্য, স্বামী মহিমের প্রথম থেকেই কেমন অদ্ভূত আচরণ। তবে এ বাড়ির সুন্দরী মেয়েটিকে তার দুর্জ্ঞেয় বলে মনে হয়। নাম মাধুরী। তার গতিবিধি রহস্যময় বলে মনে হয়। সারাদিন সে যে কোথায় থাকে কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না, হঠাৎ কখন কোথা থেকে এসে তার গলা জড়িয়ে চুম খেয়ে অস্থির করবে। কেমন অসংলগ্ন অস্থির কথাবার্তায় সব সময় কেমন একটা সন্দেহজনক অভীপ্সা। হঠাৎ হঠাৎ কেমন সেজেগুজে হাজির হয়, মহিমের সামনে এলে লজ্জায় জড়সড় হয়ে পড়ে। লাবণ্যকে একদিন বলে – 'নে তাড়াতাড়ি দখল কর ভাই; আমি যাই। মানুষের মন তো, মতিভ্রম হতে কতক্ষণ।'

এর পর মহিমের দিকে হেসে মাধুরী বাইরে থেকে পুটুলি করে ফুল এনে দিয়েছিল। মহিম সেই পুটুলি খুলতেই দেখা গেছিল সমস্ত ফুল চটকানো। স্বামীর আচরণের মধ্যেও অস্বাভাবিকতা লাবণ্যকে কেমন বিস্মৃত করেছে। একলা ঘরে আটকিয়ে শিকল তুলে দিয়েছেন। অনেক পরে মাধুরি তাঁকে দরজা খুলে দিয়ে বলেছে – 'আর আমি এই

ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি যে তুই পালিয়ে গেছিস। দেখ দেখি তোর অন্যায়! এমন করে মানুষকে হতাশ করে?' কথা রহস্য ঘটনার রহস্য কিছুই বুঝতে পারে না।

গল্পে আগাগোড়া বিস্ময় থেকে গেছে। গল্প শেষেও থেকে গেছে একগুচ্ছ অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্ময়। কথক বলেছেন - 'পোল পার হইয়া মহিম লাবণ্যকে লইয়া কোথায় গিয়াছে আমি জানি না। আমার কল্পনার অন্ধকারে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছে। কে জানে, মাধুরী হয়তো সেই জনহীন ধবংসাবশিষ্ট প্রাসাদের কক্ষে-কক্ষে এখনো প্রেতিনীর ম তো ঘুরিয়া বেড়ায়। হয়তো আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাবণ্যকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে।'

৫.৪ অনুশীলনী

১) কল্লোলগোষ্ঠীর প্রধান লেখক হিসাবে সময়কালকে কতখানি ধরেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র আলোচনা কর।

২) প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে মধ্যবিত্ত সংকট কতখানি ধরা দিয়েছে এবং কেমন করে, যে কোন একটি গল্প আলোচনা করে দেখাও।

৩) তেলেনাপোতা আবিষ্কার গল্পে কাহিনি বর্ণনা কর।

৪) তেলেনাপোতা আবিষ্কার গল্পকে কি চেতনাপ্রবাহধর্মী গল্পের আঙ্গিকে ফেলা যাবে ? যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা কর।

৫.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১। সম্পাঃ আশিস পাঠক, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, ১৪২২, বৈশাখ।

২। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, ১ম খণ্ড, পুস্তক বিপণি, কল-৯,

১৯৮৫, অগাস্ট।

৩। ভূদেব চৌধুরী ,বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডাণ বুক এজেন্সি, কল-৭৩, ১৯৬২।

৪। সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ, প্রজ্ঞা বিকাশ, কল-৯, ১৪০৫, আষাঢ়।

৫। সুরজিত দাশগুপ্ত, বাংলা ছোটোগল্পের সূচনা ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, ১৪১২, মাঘ।

এককঃ-৬ প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাংলা ছোটগল্প ও অন্যান্য গল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

বিন্যাসক্রম

৬.১ পুন্নাম গল্পের কাহিনি বিশ্লেষণ ও গল্পের গভীরে আলোচনা

৬.২ স্টোভঃ- প্রতীকী গল্প ও হয়তো- জীবনের অনিশ্চয়তার গল্প

৬.৩ শ্রেষ্ঠ গল্পের অন্যান্য গল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

৬.৪ অনুশীলনী

৬.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ পুন্নাম গল্পের কাহিনি বিশ্লেষণ ও গল্পের গভীরে আলোচনা

পুন্নাম গল্পে নির্মম নিয়তির বিরুদ্ধে সোজাসুজি লড়াই করে নয়, চুরি জোয়চুড়ি করে বেঁচে থাকার কৌশল বড় হয়ে উঠেছে। ললিত শিব সরকার। সংসার চলে কষ্টে। একটি মাত্র ছেলে রোগে ভুগে মৃতপ্রায়। ডাক্তারের পরামর্শ হাওয়া বদল করতে হবে। ললিতও জুয়াচুরি করে বউ ছবি ও ছেলেকে চেঞ্জে নিয়ে যায়। ছেলে ভাল হয়ের ওঠে। কিন্তু এই পাঁচ বছরের শিশুর অন্ধ অবোধ স্বার্থপরতা না কমে কদর্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিবেশি শিশু টুনুর উপর ছেলের অত্যাচারের শেষ নেই। শেষ পর্যন্ত টুনু রোগে ভুগে মারা যায়। আর বেঁচে যায় ঈর্ষা পরায়ণ নীচ মনোবিত্ত সম্পন্ন খোকা। দারিদ্র্য তাড়িত, সৎ জ্ঞান বর্জিত চুরি জুয়াচুরি মিথ্যাশ্রয়ী ললিতের বিবেক দংশন তীব্র হয়ে ওঠে। সে প্রায় আর্তনাদ করে উঠে স্ত্রীকে বলে টুনু মরে গেল, আর আমাদের

ছেলে বেঁচে উঠল। আশ্চর্য এক ছবি? আমাদের ছেলের মতো আরো কোটি কোটি ছেলে বাঁচবে বড় হবে রেসারেসি কাটাকাটি মারামারি পৃথিবীকে সগরম করে রাখবে আরো স্বীকার করে চুরি করেছি। ... কিছু হবে না ভয় নেই, সেটুকুই মজা। এ চুরি কখনোও ধরা পড়বে না। চিরকাল ধরে শুধু আমাকে খোঁচা দেবে। বেঁচে থাকার জন্য বিবেককে বলি দেয় যে নিম্নমধ্যবিত্ত তাদেওই মর্মবেদনার শিল্পরূপ এই গল্প। বেনামী বন্দর এর এই গল্পগুলি রয়েছে লেখকের সহানুভূতি, নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনের কারুণ্য ও রিক্ততার দিক।

১৯১৩ সাল ফ্রয়েডের "The Interpretation of dreams" এর অংরেজি অনুবাদের পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানুষ এক নতুন নির্জ্ঞান মনের সন্ধান পেল। বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় এবং চোখের বালি সেই নির্জ্ঞান মনের অথবা চেতনাপ্রবাহ রীতি প্রকাশের প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে। নষ্টনীড় এর চারুর ভিতরকার দ্বন্দ্ব আজও বিস্ময় উদ্রেক করে, কিন্তু সেখানে কোন যৌনতা আসে নি। কিন্তু কল্লোল পর্বে যৌনচেতনা ও যুদ্ধোত্তর মানসিকতার সংমিশ্রণে মানসিকতা গড়ে উঠেছে। তবে তার গল্পগুলি বুদ্ধিদীপ্ত ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পূর্ণ। নরনারীর সম্পর্ক প্রেম ও দাম্পত্যজীবন, তাঁর গল্পে প্রতিভাত।

সাহিত্যের বাস্তবতা আর দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা এক জিনিস নয়। শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা নয়, বহিরিন্দ্রিয় দিয়েও নিজেকে জানবার জন্য মানুষ সাহিত্যের কাছে হাত পাতে। দৈনন্দিন কোন বিশেষ ঘটনা এক জন লেখকের কাছে একেক রকম ভাবে প্রতিফলিত হয়। কল্লোল যুগ বলতেই আমাদের মস্তিষ্কে যে ধারণার জন্ম হয় তা দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প বিচার করলে তাঁর প্রতি অবিচারই করা হবে। দুজন লেখকের মধ্যে অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও গভীরতার পার্থক্য থাকে। সেটা খুঁজে বের করাই পাঠকের কাম্য হওয়া উচিত। গল্পটির বিন্যাস এক নিম্নমধ্যবিত্ত দম্পতির অসুস্থ পুত্রকে কেন্দ্র করে। নিয়তির সঙ্গে সহাবস্থানই এই গল্পের মুখ্য বিষয়। ছবি ললিতের একমাত্র সন্তান খোকা। এক অদ্ভুত অসুখ খোকার জীবন ও ছবি ও ললিতের দাম্পত্যকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। জাহাজের ডকের চাকরিতে কোন রকমে সংসার চলে, কিন্তু ডাক্তারের

পরামর্শ মেনে খোকা বেরাতে নিয়ে যাবার সাধ্যি ললিতের নেই। খোকা সব সময় কাঁদে, " ছবি রাগের মাথায় চাপড় মেরে ফেলে সন্তপ্ত হয়ে নানারকম করে ভোলাতে চেষ্টা করে। ভীতভাবে স্বামীর বিছানার দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করে স্বামীর অসময়ে নিদ্রার ব্যাঘাত হল কি না। নিজের দুচোখে সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি ঘুমে জড়িয়ে আসে। কিন্তু শিশু কিছুতেই থামে না। আদর নয়, খেলনা নয়, কিছু সে চায় না। শুধু তার অন্তরের অসীম বিদ্বেষ কান্নার আকারে উথলে উথলে ওঠে। কান্না নয় – সে সৃষ্টির প্রতি অভিশাপ।" এর পর গল্প মোর নেয় অন্যভাবে, পাশের এক বাচ্চা ছেলে টুনু খোকার সঙ্গে খেলতে আসে, সে কেমন যেন খোকার মত হয়ে পড়ছে, এদিকে খোকা সেরে উঠছে ক্রমশ। সুস্থ হয়ে উঠছে খোকা। হঠাৎ রাত্রে টুনুদের বাড়ি থেকে কান্না শুনতে পেল, কাল রাত থেকেই টুনুর বাড়াবাড়ি হয়েছিল। আজ ছেলেটা মারা গেছে। ললিত বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বিকৃত স্বরে বললে, 'টুনু মরে গেল আর আমাদের ছেলে বেঁচে উঠল –ন আশ্চর্য নয় ছবি?' এর পরেই উগ্র কণ্ঠে বলল ললিত, 'চেঞ্জে আসবার টাকা কি করে যোগাড় করেছি জানো ছবি? সন্তান কে পৃথিবীতে আনবার দায়িত্বে কি করেছি জানো?'

'চুরি করেছি, জুয়াচুরি করেছি, লুকিয়ে জাহাজের গাঁটরি বিক্রি করেছি। ভবিষ্যতের মানুষের দাবি মেটাতে অন্যায় করিনি নিশ্চয়।'

হয়তো খোকাও নিজের অজান্তেই টুনুর প্রাণ এভাবেই চুরি করেছে! 'আমাদের ছেলের মতো আরো কোটি কোটি ছেলে বাঁচবে, বড়ো হবে, রেষারেষি, মারামারি, কাটাকাটী করে পৃথিবীকে সরগরম করে রাখবে; নইলে আমাদের এত চেষ্টা এত কষ্টস্বীকার যে বৃথা ছবি!' এই উক্তি ত্মধ্যেই লিকিয়ে আছে কি ভয়ঙ্করতম মর্মান্তিক বাস্তব।

পঞ্চাশের বা ষাট দশকের বাংলা ছোটগল্পের শেষ অংশে চমকের বদলে যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, রবীন্দ্রনাথের পর দ্বিতীয় ছোটগল্পকার হিসেবে এ শিল্পরীতির প্রবর্তক প্রেমেন্দ্র মিত্র – একথা নিঃসন্ধেহে বলা যায়। দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রিয় বিষয়। এই থীমে বারে বারে ফিরে এসেছে তাঁর বহু গল্পে। মনে হতে

পারে, একই তাসকে তিনি বারবার ফিরিয়ে দেখাচ্ছেন অন্যভাবে। আসলে ব্যক্তিসত্তার গভীরে দ্বন্দ্বকে রূপ দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতাকে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন কৌণিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেয়েছেন তিনি, প্রতিটি গল্পে দিতে চেয়েছেন আলাদা ব্যঞ্জনা।

৬.২ স্টোভ - প্রতীকী গল্প ও হয়তো জীবনের অনিশ্চয়তার গল্প

এই পর্যায়ের গল্পের মধ্যে স্টোভ একটি প্রতীকি গল্প। স্টোভ বাসন্তীর মনের প্রতীক। বাসন্তীর স্বামী শশিভূষোণ অবিবাহিত জীবনে যে মল্লিকা ভালোবেসেছিল সেই মল্লিকার আগমণে বাসন্তীর জীবনে উঠেছে প্রচন্ড ঝড়। স্টোভে চা করতে গিয়ে বাসন্তীর মনে কমপ্লেক্স সৃষ্টি হয়েছে। স্টোভের আওয়াজের তীব্রতায় সেই কমপ্লেক্সের তীব্রতায় সূচিত করেছে। স্টোভের গর্জন যেন শিশিভূষ্ণ ও বাসন্তীর সুখী জীবনের ঝড়। তাই বাসন্তী প্রাণপণ চেষ্টাতে বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনার আত্মঘাতী বিস্ফোরণ বন্ধ করতে সচেষ্ট। সে তাঁর বিক্ষুদ্ধ আত্মজয়ের সকল প্রয়াস করেছে তাই মানসিক দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাসন্তীর স্বামী শশিভূষণ অবিবাহিত জীবনে যে মেয়েটিকে ভালোবেসেছিল, সেই মল্লিকা শশিভূষণ বাসন্তীর সংসারে হঠাৎই চলে এসে একদিন আলোড়ন তোলে। ভাঙা স্টোভটা যেন বাসন্তীর মনের প্রতীক, যার আর উত্তেজনা বহনের ক্ষমতা নেই। ওদের দাম্পত্য জীবনেও অনেক বিস্ফোরণের আয়োজন থাকে, কিন্তু তা আর ফেটে পড়তে পারে না। দৈনন্দিনতার চাপে ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে যায় ওই ভাঙা স্টোভের মতো।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ছোটগল্পে প্রায়ই এক অন্ধকারের কথা বলেন। যে অন্ধকার হয়তো মানুষের আদিম নিয়তি। যে অন্ধকারের হাত থেকে মানুষের পরিত্রাণের কোন পথ নেই। যে অন্ধকার সম্ভবত অস্পষ্ট চেতনার এক রহস্যময় প্রতীক। 'পোল পার হইয়া মহিম লাবণ্যকে লয়া কোথায় গিয়াছে আমি জানিনা। আমার কল্পনার অন্ধকারে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছে।' এ রকম অজস্র অন্ধকার বিষয়ক পঙক্তি তাঁর গল্প থেকে উদাহরণ দেওয়া যায়। হয়তো – গভীর দুর্যোগের রাত্রিতে একটি একটি আশ্চর্য ঘটনা

লেখকের মনে জাগিয়ে তুলেছিল একরাশ হয়তো'র প্রশ্ন। নির্জন পথে চলতে চলতে একটি অর্ধসমাপ্ত সেতু পার হতে হবে, সামনে দেখতে পেলেন একটি নরনারী কেরোসিনের বাতি হাতে দুর্গম সেতু পার হাবার চেষ্টা করছে, মেয়েটি আসতে চাইছে না। পুরুষটি তার হাত ধরে পোলের অন্য প্রাপ্ত থেকে সেতু পার হচ্ছে। এমন সময় লেখক শুনতে পেলেন মেয়েটির চিৎকার। পোলের ধারে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেছে। এতক্ষণে হয়তো স্রোতের টানে ভেসে গেহে। সাঁতার জানলেও এই স্রোতে রাত্রিতে উদ্ধার করা মুশকিল। হঠাৎ অনেক নীচ থেকে অস্পষ্ট কাতর আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল, পরমুহূর্তে তার শাড়ির প্রান্ত টুকু চোখে পড়ল। মেয়েটিকে উদ্ধার করে যখন ফিরছেন তখন দম্পতির যে অস্পষ্ট অথচ ভয়ঙ্কর কথা শোনেন তাতেই লেখক বিস্ময়চকিত হয়ে যান – "মেয়েটি পুরুষের সহিত চলিয়া জাইতে জাইতে বলিতেছিল – কী আশ্চর্য দেখো, প'ড়ে যাবার সময় আমার যেন মনে হল তুমি আমায় ঠেলে দিলে। পা ফসকে তো পড়িনি, আমার যেন ঠিক মনে হল তুমি ঠেলে দিলে..." এই কথা ও ঘটনার প্রেক্ষিতেই লেখকের মনে আপনা থেকেই একটি কাহিনি গড়ে ওঠে – যেখানে এক প্রকান্ড সাত মহলা দালান। চারিধারে নোনা ধরা স্তূপ। বাইরে থেকে দেখলে ভুতুরে পোড়াবাড়ি বলে মনে হয়। জড়াজীর্ণ বাড়িটির কোনো গোপন কক্ষে এখনো মুমূর্ষু প্রাণ ধুকধুক করে যেন জ্বলছে। এই ধ্বংসাবশেষের অন্তরাল থেকে কোথায় মানুষের জীবনের ধারা বয়ে চলছে তার সন্ধান পাওয়া নিশ্চিত নয়। রাত্রে দেখা যায়, ধ্বংসস্তূপের মাঝখান থেকে ক্ষীণ আলোকরেখা আসছে। এমনই এক বাড়িতে বিয়ে হয়ে আসে লাবণ্য, স্বামী মহিমের প্রথম থেকেই কেমন অদ্ভূত আচরণ। তবে এ বাড়ির সুন্দরী মেয়েটিকে তার দুর্জ্ঞেয় বলে মনে হয়। নাম মাধুরী। তার গতিবিধি রহস্যময় বলে মনে হয়। সারাদিন সে যে কোথায় থাকে কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না, হঠাৎ কখন কোথা থেকে এসে তার গলা জড়িয়ে চুম খেয়ে অস্থির করবে। কেমন অসংলগ্ন অস্থির কথাবার্তায় সব সময় কেমন একটা সন্দেহজনক অভীপ্সা। হঠাৎ হঠাৎ কেমন সেজেগুজে হাজির হয়, মহিমের সামনে এলে লজ্জায় জড়সড় হয়ে পড়ে। লাবণ্যকে একদিন বলে – 'নে তাড়াতাড়ি দখল কর ভাই; আমি যাই। মানুষের মন তো, মতিভ্রম হতে কতক্ষণ।'

এর পর মহিমের দিকে হেসে মাধুরী বাইরে থেকে পুটুলি করে ফুল এনে দিয়েছিল। মহিম সেই পুটুলি খুলতেই দেখা গেছিল সমস্ত ফুল চটকানো। স্বামীর আচরণের মধ্যেও অস্বাভাবিকতা লাবণ্যকে কেমন বিস্মৃত করেছে। একলা ঘরে আটকিয়ে শিকল তুলে দিয়েছেন। অনেক পরে মাধুরি তাঁকে দরজা খুলে দিয়ে বলেছে – 'আর আমি এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি যে তুই পালিয়ে গেছিস। দেখ দেখি তোর অন্যায়! এমন করে মানুষকে হতাশ করে?' কথা রহস্য ঘটনার রহস্য কিছুই বুঝতে পারে না।

গল্পে আগাগোড়া বিস্ময় থেকে গেছে। গল্প শেষেও থেকে গেছে একগুচ্ছ অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্ময়। কথক বলেছেন - 'পোল পার হইয়া মহিম লাবণ্যকে লইয়া কোথায় গিয়াছে আমি জানি না। আমার কল্পনার অন্ধকারে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছে। কে জানে, মাধুরী হয়তো সেই জনহীন ধবংসাবশিষ্ট প্রাসাদের কক্ষে-কক্ষে এখনো প্রেতিনীর ম তো ঘুরিয়া বেড়ায়। হয়তো আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাবণ্যকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে।'

৬.৩ শ্রেষ্ঠ গল্পের অন্যান্য গল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আর একটি গল্প 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'। এও এক অন্ধকারের গল্প। পতিতাবৃত্তিকে যদি বিকৃত ক্ষুধা বা পার্ভারসনের পরিতৃপ্তির মাধ্যম হিসেবে মনে করা যায়, তাহলে এই গল্পের পাত্রী বেগুন সেই ফাঁদে ধরা পড়েছে।

'শৃঙ্খল' গল্পের প্রধান বিষয় দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। হতাশা, অবিশ্বাস ও ঘৃণার অন্ধকার নিয়েও যে স্বামী – স্ত্রীতে সংসার করা যায় সেই বাস্তব চিত্রই এই গল্পের একমাত্র আকর্ষণ। সবামী-স্ত্রীর অভ্যাস শয়ন বৃত্তান্ত, পরদিন সকালে নিঃশব্দে বাজারের থলে নিয়ে বেরিয়ে পড়া, তারপর খাওয়া সেরে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার মধ্যে যে হাহাকার ফুটে উঠেছে তা পাঠককে প্রবলভাবে ধাক্কা দেয়। গল্পহীনতাও যে কিভাবে গল্প হয়ে উঠতে পারে এই আধুনিক তত্ত্বের নিরীক্ষা তিনি এই গল্পে করেছেন। এবং করেছেন প্রায় সার্থক ভাবেই। আধুনিক দম্পতি বছরের পর বছর এক ছাদের নীচে

থাকলেও পরস্পরের কাছে কেমন অচেনা থেকে যায়। কীভাবে ভালোবাসাহীন আত্মা নীরবে ক্ষয়ে যায় তার অসামান্য দলিল চিত্র এই শৃঙ্খল। এ যুগের সর্বগ্রাসী শূণ্যতা প্রেমকেও যে গ্রাস করে নিচ্ছে সেটা বহু আগে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

ব্যর্থ পুরুষকারের গল্প 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী'। মধ্যবিত্ত পুরুষের শৈত্য, নির্লিপ্ততা ও ভূমিকাহীন চরিত্রই এই ছোটগল্পটির বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের পর প্রেমেন্দ্র মিত্রই সম্ভবত ছোটগল্পকার হিসেবে অনন্য, একক এবং স্বতন্ত্র সন্দেহ নেই। তাঁর প্রথম গল্প 'শুধু কেরানী' প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন পাঠক সমাজ তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে কেবলমাত্র কল্লোল যুগের লেখক বলে তকমা এঁটে দিলে বড়ো ভুল হবে। যখন অবক্ষয় ও হতাশাপীড়িত যৌবনের সামনে ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হচ্ছিল প্রেমের রোমান্টিক স্বপ্নচিত্র, সেই সময় প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা ছোটগল্পে নিয়ে এলেন নতুন হাওয়া। লেখার স্টাইল নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র শিল্পরীতি। ভাষার আনলেন প্রাণ, প্রবর্তন করলেন নির্ভার গদ্যভাষার। যখন তাঁর সমসাময়িক গল্পকারদের গল্পের সংলাপ অতিকথন দোষের দুষ্ট, তখন চরিত্রের বর্ণনা না দিয়ে কেবলমাত্র ছোট নির্বিকার অথচ তীব্র সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তোলেন কত সহজে, আগুন জ্বালিয়ে দেন জত মিথ্যে মায়া মোহ ও মমতায়।

'কুয়াশা' গল্পটিতে পিসিমার পাতানো বোনের মেয়ে সরমার সঙ্গে নরেনের ধীরে ধীরে ভালোবাসা গড়ে ওঠার পর, দেহের আকর্ষণই একমাত্র সত্য নয় জেনে নরেনের পকেটে থাকা খেলনাটাই তার মনের কুয়াশা কাটিয়ে দেয়। সরমাও শীতের রাত্রিতে কুয়াশার ভেতর হারিয়ে যায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের আর একটি গল্প 'ভবিষ্যতের ভার'। এই ছোটগল্পের বিষয় শিক্ষাবিদের আদর্শহীনতা যা আজকের দিনের মূল্যবোধে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। জাতির ভবিতব্যের ভার যাঁদের ওপর তাঁরাও কেমন ভারহীন হয়ে পড়েন অলক্ষ্যে তার করুণতম প্রকাশ এই গল্প।

‘রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন?’ গল্পটি ঘনাদা ঘরানার গল্প। নান্‌সু কিতান দলপতি চুয়াসানের কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আপন প্রেমিক নৌ – সেনাপতি সি-হুয়ানের সঙ্গে সাতদিন সাতরাত ভেসে চলেছিল অনন্ত সাগরে। মাঝে ওঠে সামুদ্রিক ঝড়। সেই ঝড়ের ভেতরে নান্‌-সু বিছিন্ন হয়ে যায়। সি-হুয়ান চিৎকার করে, ভয় নেই নানসু – আমি যাচ্ছি। নান্‌সু এসে পড়ে এক বিছিন্ন দ্বীপে। দিনের পর দিন সেই দ্বীপে দিন কাটায় নান্‌সু সি-হুয়ানের অপেক্ষায়। একদিন সি-হুয়ান আসে কিন্তু সে প্রকৃত সি-হুয়ান নয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনারীতিকে বুঝতে হলে সবচেয়ে আগে জানতে হবে তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বস্তু কী এবং কেন। তাঁর গল্পে বর্ণিত চিত্রকল্পগুলি আমাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে নেওয়া। মনে হয় বড় চেনা চেনা। অথচ ছবিগুলো চলচ্চিত্রের মতো চোখের সামনে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। সবকিছু ভেদ করে ফুটে ওঠে তাঁর উপলব্ধির জগৎ।

গল্পের মধ্যে চকিতে ধুকে পড়তে পারেন তিনি। তার জন্য আগাম কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে না। মুহূর্তের মধ্যে পাঠকের মগ্নতাকে গ্রাস করে নেন। ভূমিকা করেন না, উপদেশ দেন না কোনো, মুখে বলা গল্পের মতো মতো সহজ স্বচ্ছন্দ স্রোতে বয়ে চলে তার ছোট গল্প। বাকচাতুর্যপ্রায় নেই বললেই চলে। তাই হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুক্তিসিদ্ধভাবে ঠাসবুনোট নয়। হয়তো তথাকথিত কোনো গল্পাংশকে টেনে আনে না। খুব সূক্ষ্মভাবে কোথাও বা পাওয়া যাবে অ্যাবসার্ডিটি ছোঁয়া। এসবই আধুনিক ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত। তিনি বুঝেছিলেন, যে ধ্বনি মানুষের চেতনার গভীরে বেজে ওঠে তাঁকে ঠিকমত ধরতে পারলেই ছোটগল্প সার্থক হবে। তাই সব সময় আর্ট জীবনকে অনুকরণ করবে তা বিশ্বাস করতেন না। তাই কোনো গল্পে ঘটনা ও চরিত্রকে ইচ্ছে করেই অর্থবহ করে তোলেন নি!

সংশয়ই প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের প্রধান চরিত্র। এই সংশয়ই নানা গল্পে ফিরে ফিরে এসেছে। ছোটগল্পে ক্রিয়ার কালের দিক থেকে নতুন প্রয়োগ ঘটালেন তিনি ‘’তেলেনাপোতা আবিষ্কার’ গল্পে। ভবিষ্যৎকালে বাচক ক্রিয়াকে অদ্ভুতভাবে এ গল্পে

ব্যবহার করেছেন। 'ইল' প্রত্যয়ের পৌনঃপুনিক ব্যবহার তাঁর ভাষাবিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু শিথিলতা এনেছে। হয়তো ইচ্ছে করেই জীবনের একঘেয়েমি বোঝাতে পাঠককে খুঁচিয়ে দিয়েছেন প্রেমেন্দ্র। এও এক আধুনিক শিল্পরীতি।

এই প্রসঙ্গে ছোটগল্প সম্পর্কে লেখকের নিজের মন্তব্যটি কৌতূহল জাগায়। '...সব গল্পরই আরম্ভ মাঝখান থেকে, খেয়ালমত জোর করে হঠাৎ আরম্ভ, গল্প আমরা শুনতে চাই গোরা থেকে। কিন্তু কোথায় গোড়া, কোথায় গল্পের চসে রহস্যময় মূল অন্ধকার মাটির রহস্যময় গর্ভে? গল্প চলে বহুবর্ণ স্রোতের মত বয়ে, তার মাঝের খানিকটা ধরি মাত্র...এই ঘাট থেকে বেরিয়ে আসছে নানা রঙের কাজ অফুরন্ত বনাত, আমরা মাঝখান থেকে হঠাৎ কাঁচি চালাই, কেটে আনি আক টুকরো রঙ বেরঙ এর কাপড়।' আর এক জায়গায় বলেছেন, ... শুরুও সত্যি বলতে গেলে কোন গল্পেরই নেই, শেষও না।

তাই যেখানেই প্রেমেন্দ্র সন্ধানী আলো ফেলেছেন, সেই বস্তু চমৎকৃত হয়েছে এবং একই সঙ্গে নূতন ও বহু পুরাতন বলে চিনিয়ে দিয়েছে। মনে হয় না তাঁর গল্প লিখতে প্রয়োজন হয়েছে কোনো সচেতন প্রয়াসের, কোনো অবিরাম চেষ্টার – এমনই স্বাভাবিক। ছোট গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনায় এক অদ্ভুত ঋজুতা ও ধার আমরা অনুভব করি যা আধুনিক বাংলা ছোটগল্পকে তাৎপর্য দিয়েছে।

৬.৪ অনুশীলনী

১) পুন্নাম গল্পের নিরিখে মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থনৈতিক সংকট ও চেতনাগত দ্বন্দ্ব আলোচনা কর।

২) হয়তো গল্পে আধুনিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা কেমন করে গল্পকে নিয়ন্ত্রণ করেছে আলোচনা কর।

৩) প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প কে মধ্যবিত্তের পরম্পরিত সংকটের চিত্রে কেমন ভাবে সাজাবে, গল্পগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে লেখ।

৬.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১। সম্পাঃ আশিস পাঠক, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, ১৪২২, বৈশাখ।

২। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, ১ম খণ্ড, পুস্তক বিপণি, কল-৯, ১৯৮৫, অগাস্ট।

৩। ভূদেব চৌধুরী ,বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডাণ বুক এজেন্সি, কল-৭৩, ১৯৬২।

৪। সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ, প্রজ্ঞা বিকাশ, কল-৯, ১৪০৫, আষাঢ়।

৫। সুরজিত দাশগুপ্ত, বাংলা ছোটোগল্পের সূচনা ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, ১৪১২, মাঘ।

এককঃ-৭ প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিম্নবিত্ত জীবনের ভিন্নধর্মী বয়ান

বিন্যাসক্রম

৭.১ প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিম্নবিত্ত জীবনের ভিন্নধর্মী বয়ান

৭.২ মোটবারো গল্পের নিরিখে দলিত সম্প্রদায়ের চিত্র

৭.৩ অনুশীলনী

৭.৪ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিম্নবিত্ত জীবনের ভিন্নধর্মী বয়ান

প্রেমেন্দ্র মিত্রকে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তজীবনের রূপকার বলা হয়।শহুরে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তরাতাঁর লেখা জুড়ে আছে। কিন্তু 'মোট বারো' গল্পটি এই তকমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে।কঠোর বাস্তব-নির্মম জীবনসত্যকে তুলে আনার জন্য তিনি অনেক বিচিত্র জীবনে বিচরণ করেছেন।এখানে নিম্নবিত্তের পরেও নেমেছেন গল্পকার—নেমেছেন এমন এক অবহেলিত-ব্রাত্য-ইতর-অন্ত্যজজীবনে, যে জীবন মানুষ ও পশুর পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহাবস্থানে অতিবাহিত হয়—সে জীবন প্রবৃত্তিনির্ভর-পুরোপুরি জৈবিক, সভ্যতার দীর্ঘ সান্নিধ্য যাদের মধ্যে হৃদয়ের বিকাশ ঘটাতে পারেনি।সেই ইতর-অন্ত্যজ-পিছিয়ে পড়া জীবনের নির্মম সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন এখানে।

প্রাথমিক অবস্থায়,বন্যজীবনে,জৈবিকধর্মে মানুষ ও পশু ছিল এক।মানুষের মধ্যে Rationality আছে।পরবর্তীকালে,সভ্যতার অগ্রগতির সাথে তাল রেখে Rationality দিয়ে মানুষ তার প্রবৃত্তির মুখে লাগাম লাগিয়ে ভদ্র হয়েছে। কিন্তু পশুরা তা

পারেনি।এই গল্পের নায়ক ঘমণ্ডি পশুদের থেকে সামান্য উপরের স্তরের, কিন্তু মানুষের থেকে নিচের স্তরের লোক।তাই সময়ে সময়ে ঘমণ্ডি ও পশুদের মধ্যে আচরণগত কোনো ফারাক থাকে না।বন্য অবস্থায় যেমন ছিল না।তারপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে।মানুষ তার বল ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সভ্যতার জন্ম দিয়েছে, সমাজ গড়েছে। সেই সমাজেও বুদ্ধি ও শোষণকে হাতিয়ার করে একদল মানুষ অন্যদের উপর আধিপত্য করেছে, অধিকাংশ সুযোগসুবিধা নিজেদের করায়াত্ত করেছে।আর শোষিত, অবহেলিত মানুষগুলি পিছতে পিছতে ফিরে গেছে তাদের মূলে-আদিমজীবনে।নায়ক ঘমণ্ডি এই জীবনের প্রতিনিধি।

৭.২ মোটবারো গল্পের নিরিখে দলিত সম্প্রদায়ের চিত্র

ঘমণ্ডি আরা জেলার লোক।শৈশবে শোন নদীর বন্যা তাকে ছিন্নমূল করে ভাসিয়ে দিয়েছিল অজানা জীবনের স্রোতে।তারপর বিশ বৎসর ধরে "সংসারের আনাচে কানাচে গলিতে ঘুঁজিতে সে কোনো লক্ষ্যহীন স্রোতের খামখেয়ালিতে অসহায়ভাবে ভেসে ফিরেছে;অপ্রত্যাশিতভাবে আছাড় খেয়েছে, অযাচিতভাবে আশ্রয় পেয়েছে, আবার অকারণে বিতাড়িত হয়েছে" ।অবশেষে, ত্রিশ বছর বয়সে একটি ঘোড়ার অনুগ্রহে তার স্থায়ী ঠিকানা মিলল।একদিন এক উঠতি জোয়ান ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে সহিসকে ঘায়েল করে দৌড় দিল রাস্তায়।লোকেরা আহত হল।মোড়ের মাথায় গরুর গাড়িতে বাধা পেয়ে থামতেই ঘমণ্ডি সাহস করে সামনে এসে লাগামটা ধরে ফেলল।কিছুদিন কোচোয়ানী করার অভিজ্ঞতা ছিল তার।ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে গেলে মালিক তাকেই অস্থায়ীভাবে সহিসের পদে বহাল করে দিল।এরপর শুরু হল ঘমণ্ডির আর এক জীবন।গঙ্গার ঘাটে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য নির্মিত দুটি জীর্ণ ঘরের বাসিন্দা হল সে।

তারপর দীর্ঘ পনের বছর কেটে গেছে—"ঘোড়া ও মানুষ পাশাপাশি জীবনের পথে বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছে" ।মানুষ ও ঘোড়া একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনের পথ হেঁটে বুড়ো হয়েছে।অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দুজনের মধ্যে।একে অপরকে বোঝে—"ঘোড়াটি সামনের বাঁ পা তুলে আঁচড়াবার ভঙ্গি করে।ঘমণ্ডি বলে, 'এ

বুঢুয়া!তোমার ভুখ লাগল হো।' বুঢুয়া কান দুটি নেড়ে গলাটি বাড়িয়ে দেয়। পরস্পরের নাড়ি নক্ষত্র জানে"।'আদরিণী' বা 'মহেশ'-এর মত পশুপ্রেমের গল্পের উত্তরসূরী নয় এ গল্প।বরং,এ গল্প পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েমানুষ ও পশুর সহাবস্থানের গল্প ।ঘমণ্ডির সংসারে আরো সদস্য আছে।পনের বছর আগে এক শীতের সকালে ঘমণ্ডি দুই সদ্যজাত কুকুরছানাকে ঘরে নিয়ে আসে।অনেক আদরযত্নে দুখিয়া বাঁচে,অন্যটি মারা যায়।নতুন সদস্য হয়ে এসে দুখিয়া ঘোড়াটিকে সুনজরে দেখেনি—"ঘোড়ার সাজগুলো একটু একটু চেটে দেখে, দুটি ঘরের মাঝখানের দরজায় দাঁড়িয়ে—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘোড়াটিকে পর্যবেক্ষণ করে সংক্ষিপ্ত ভাষায় নিজের বিরূপ মন্তব্য ব্যক্ত করে।ঘোড়াটি একবার ঘাড় বাঁকিয়ে সন্দিগ্ধভাবে তার ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়, তারপর এই নগণ্য সমালোচনা উপেক্ষা করে প্রশান্ত মনে পা ঠোকে, লেজ দুলিয়ে মাছি তাড়ায় ও নাসিকাধ্বনি করে।এই নাকের শব্দে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে, কুকুর বাচ্চা কটুতর ভাষা প্রয়োগ করে"।দুখিয়ার মাত্রাতিরিক্ত সাহস একদিন অল্পের উপর দিয়ে বিপদ ঘটিয়ে দেয়।অবশ্য পরে মিটমাট হয়ে যায়।একই সংসারে থাকা সদস্যদের মধ্যে যেমন হয়।

গল্পকার পশুদের মধ্যে মানুষের রাগ, ঈর্ষা, অভিমান, প্রণয় ইত্যাদি অনুভূতি আরোপ করে চরিত্রগুলির মানবায়ন ঘটিয়েছেন।বয়সে সঙ্গে সঙ্গে দুখিয়ার সাহসও বেড়েছে।একবার এক কাবুলিওলার সাজপোশাকের অশোভনতা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।তারপর "একদিন ভাল্লুকসমেত এক বাজীকরকে বহুদূর পর্যন্ত ধাওয়া করে এল।ভল্লুক তো পালিয়ে গেলই, একবার ফিরে তাকাতেও সাহস করলে না।সবার জীবনে যেমন একটা স্মরণীয় দিন আসে,দুখিয়ার জীবনেও এটা একটা স্মরণীয় দিন।দুখিয়া তার বীরত্বের কথা অনেকভাবে ঘমণ্ডিকে বোঝাবার চেষ্টা করে।এমনকি ঘমণ্ডি যখন "প্রতিদিনের মতোই সে উচ্ছিষ্ট ভাত কটা থালায় রেখে ডাকলে, 'লে দুখিয়া।' দুখিয়া প্রতিদিনের মতো ত্রস্ত হয়ে ছুটে গেল না"।বরং ঘরে উপদ্রবকারী ইঁদুরগুলিকে সমুখ সমরে আহ্বান করে একটা রক্তারক্তি ঘটাতে উদ্যোগী হল।কিন্তু তাতেও যখন ঘমণ্ডি ভ্রূক্ষেপ করল না,তখন অগত্যা দুখিয়াকে খেতে আসতেই

হল।এরপর শুরু হল দুখিয়ার পাণি প্রার্থীদের ভিড়।কিন্তু—"দুখিয়ার নাগাল পাওয়া এখন ভার!নারীর ছলাকলা কৌশল তার পুরোদস্তুর আয়ত্ত"।সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই দুখিয়ার বাচ্চা ও তার দৌহিত্র-দৌহিত্রীরা ঘমণ্ডির ঘর সরগরম করে তুলল।

ঘমণ্ডির প্রতিবেশী দুলারী—মধ্যবয়স্কা, স্থূলকায়া, বাবুদের বাড়িতে কাজ করে।এবার সে দেখেশুনে কোথাও নোঙর ফেলতে চায়।তাই গায়ে পড়ে ঘমণ্ডির সাথে ভাব জমাতে চায়।কিন্তু ঘমণ্ডি তাকে পাত্তা দেয় না।দুলারী 'অনিমন্ত্রিত' হয়েই তার কাছে বসে পড়ে আর শীতের রাত্রে বাবুদের রকে শুয়ে রাত কাটানোর কষ্ট জানায়-ইচ্ছা ঘমণ্ডি যদি তার কষ্টের কথা শুনে তাকে ঘরে শুতে দেয়।কিন্তু ঘমণ্ডি তার ফাঁদে পা দেয় না।তার উচ্ছ্বাসে কান না দিয়ে সে ধারের টাকার তাগাদা দেয়।তারপরেও দুলারী আসে কিন্তু টাকার কথা মনে রাখে না।বরং সে ঘমণ্ডির এঁটো বাসন মেজে দিতে চায়।ঘমণ্ডি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে কিন্তু অস্বীকার করে না।দুলারী তার মনের ভাব আঁচ করতে পারে।তাই সে ঘমণ্ডিকে টোপ দেয়,--"বকরীটার আবার শিগগির ছানা হবে, বাবুদের চাকরিটাও বেশ সুখের, তার অভাব কিসের?"। ঘমণ্ডি সম্প্রতি একটি তিতির পাখি কিনেছে, তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে।দুলারীর এসব প্রলোভনে সে পায় দেয় না।

দুলারী কিন্তু হাল ছাড়ে না।নিজেকে ঘমণ্ডির কাছে মূল্যবান করে তোলার জন্য জানায়, সেদিনের ছোঁড়া হরদুঙ্গি তাকে 'পিয়ারী' হবার প্রস্তাব দিয়েছে।কিন্তু সে রাজী নয়—"ঘর করতে গেলে কি আর লোক নেই?" ঘমণ্ডি ভাবে, তারপর তাকে ছাগলের দুধের দাম জিজ্ঞাসা করে।দুলারী এবার আসল চালটা চালে।সে বলে—"ছাগলের দুধ টাকা টাকা সের!ছাগলের দুধ অমন সস্তা জিনিস নয়!আর তার ছাগলি এই বাচ্চা হলেই তো রোজ দুসের দুধ দেবে!" ঘমণ্ডি লাভ-লোকসানের হিসাব করে।দুলারী রুটি বানিয়ে দিতে চাইলে না বলে না, উল্টে তার জন্যও বানিয়ে নিতে বলে।দুলারীকে আর সে প্রত্যাখ্যান করে না।দুলারীও কম চালাক নয়, তাকে খোঁচা দিয়ে শোনায়—"গলির ভেতর ডাগদর বাবুর বুড়ো কোচোয়ান নাকি ত্রিশ টাকা মাইনে পায়"।ঘমণ্ডির আত্মসম্মানে লাগে।সে জানায়—"এ অঞ্চলে ত্রিশ টাকা ঘমণ্ডি ছাড়া কেউ পায় না"।কাজ সেরে চলে যাবার সময় ঘমণ্ডি আবারও তাকে দুধের দাম জিজ্ঞেস করে।

ঘমণ্ডি লাভ-লোকসানের হিসাব কষে দেখে দুলারীকে সঙ্গে নিলে লাভ বই লোকসান নেই তার।ফলে,--"অনিচ্ছুক ছাগলিটার গলার রশি ধরে টানতে টানতে দুলারী একদিন ঘমণ্ডির আস্তানায় এসে উঠল"।ঘরে স্থানাভাব হয়।দুখিয়ার বাচ্চাগুলি নতুন সদস্যদের জায়গা করে দেয়—"তারা আপনা থেকেই গাড়ির ভিতর রাত্রিবাস করবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে"।একসঙ্গে থাকতে থাকতে দুজনের ধাপ্পাই দুজনের কাছে ধরা পড়ে যায়—ছাগলিটার বাচ্চা হলে ঘমণ্ডি একদিন দুসের দুধ না হওয়ার জন্যে গালাগাল করেছিল বটে, কিন্তু দুলারীও তার জবাব দিয়েছিল, 'ত্রিশ টাকা মাইনে কোথায় গেল?"

এইভাবেই দিন কাটতে লাগল।এর মধ্যে একটি ছাগল কি খেয়ে মারা গেল।আর একটি গাড়ি চাপা পড়ে খোঁড়া হয়ে এল।একটা বিড়াল এসে জায়গা নিল তাদের সংসারে।আহার,নিদ্রা,মৈথুনের জীবনচক্রে এক হয়ে যায় পশু ও মানুষ। ঘমণ্ডি ও দুলারী যে স্তরের মানুষ তাতে এই পশুদের সাথে তাদের জীবনযাপনের খুব বেশি ফারাক নেই।প্রবৃত্তিময়, জৈবিকধর্ম-প্রধান জীবনযাপনে এরা এক হয়ে গেছে—"মানুষ ও পশু জাগে, মানুষ ও পশু আবার রাত্রে গায়ে গায়ে তাল পাকিয়ে নিদ্রা যায়"।ঘমণ্ডি আস্তে আস্তে সহজ হয়ে আসে রামজীবন, হরদুঙ্গিদের সাথে।

এইভাবে কেটে যায় আরো এগারো বছর—"দুলারীর মাথার চুলে পাক ধরেছে, মাংস আরো ঢিলে হয়েছে।চোখের কোণ আরো কুঁচকেছে"।এবার সে তার ভবিষ্যতের জন্য আখের গোছাবার ধান্দায় নামে।এখানে তার আর কিছু পাবার নেই।'ভৌজাইন বেমার'-এর অজুহাত দিয়ে সে দেশে যেতে চায়।কিন্তু ঘমণ্ডি তাকে বিশ্বাস করে না।জোর করলে ঘমণ্ডি জানায়—"বেশ।কিন্তু ঘমণ্ডি আসবার আগে যেন যাওয়া না হয়"।দুপুরবেলা নিয়মের ব্যতিক্রম করে সে ঘরে ফিরে আসে আর দুলারীর পোঁটলা পুঁটলি খোলে।গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরে হঠাৎ করে ঘমণ্ডিকে দেখে চম্‌কে ওঠে দুলারী।দুলারীর পোঁটলা পুঁটলি থেকে অনেক কিছুই বের হয়।এবার "ঘমণ্ডি খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলে কাপড়টায় এক টান দিলে।এবার দুলারী সমস্ত সংযম ত্যাগ করে উচ্চস্বরে রোদনের সঙ্গে ঘমণ্ডির পিতৃ মাতৃকুলের উদ্ধার সাধন করে মুক্ত হস্তে ঘমণ্ডির ওপর কিল চড় ঘুঁসি আঁচড় কামড় বর্ষণ শুরু করে দিলে।তারপর এগারো বছর

ধরে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে জড়িত এই দুই পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে নির্লজ্জ রণতাণ্ডব শুরু হল তার বর্ণনা করা যায় না" এবং "ঘমণ্ডি বহুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করে দুলারীর কোমর থেকে সাতটি দশ টাকার নোট ও টুকরো সাতটি টাকা বার করে নিয়ে অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় তাকে লাথিয়ে ঠেলে রাস্তায় বার করে দিলে"।তারও "কাপড় জামাও কিছু আস্ত ছিল না।সারা দেহে নখ ও দন্তের ক্ষত চিহ্ন"।হরদুঙ্গি, হরজীবন ছুটে এসে মিটমাট করে নিতে বলে—"এগারো বরষ দুনো এক একসাথ রহলি"।ঘমণ্ডি উত্তর দেয়,—"এগারো বছর তো কি হয়েছে!"

সভ্য,শিক্ষিত সমাজের দাম্পত্যজীবন এ নয়।এগারো বছর পার করে বারো বছর অর্থাৎ এক যুগ হতে চলল যে সম্পর্কের, সে সম্পর্কে কোনো মানবিক অনুভূতিই জন্মায়নি!!জৈবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো হৃদয়ের সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি দুজনের মধ্যে!!তাই ঘমণ্ডি অনায়াসে বলতে পারে "এগারো বছর তো কি

হয়েছে!"তাই দুলারী এগারো বছর যে সংসারে রইল, অনায়াসে সেই সংসারের জিনিসপত্র চুরি করে, অতি সহজে ঘমণ্ডিকে একা ফেলে চলে যাবার মতলব করতে পারে!আসলে ঘমণ্ডিরা যে স্তরের মানুষ, সেই স্তরে এটা স্বাভাবিক।রুচি বা শিক্ষার কোনো আগল সেখানে কাজ করেনা।তাই ঘমণ্ডি এগারো বছর ধরে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে জড়িত নারীকে অর্ধউলঙ্গ অবস্থায়,লাথি মেরে সকলের সামনে রাস্তায় বের করে দিতে পারে।পশুদের মধ্যে যেমন জৈবিক চাহিদায়, প্রয়োজনে একে অপরের কাছে আসে,আবার প্রয়োজন মিটলে একে অপরকে ছেড়ে অনায়াসে চলে যায়।কোনো অস্বাভাবিকতা নেই তার মধ্যে।ঘমণ্ডি ও দুলারীঠিক সেই স্তরের মানুষ।তাই তাদের জীবনে এটাই স্বাভাবিক—এটাই সত্য।এমনকি হরদুঙ্গি ও রামজীবনও তাদের থেকে উঁচুস্তরের।তাই তাদের কাছে এটা অশোভন।কিন্তু দুলারী ও ঘমণ্ডি প্রবৃত্তি, জৈবিক ধর্মে, আচরণে ও মানসিকতায় পশুদের মতই অকপট-উন্মুক্ত।

৭.৩ অনুশীলনী

১) প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প সময়গত আবেদন কিভাবে মধ্যবিত্তের চিন্তাচেতনার সঙ্গে মিশে গেছে তুলে ধর?

২) মোটবারো গল্পের চরিত্রচিত্রণ গল্পকে কতখানি নিয়ন্ত্রণ করেছে আলোচনা কর।

৩) মোটবারো গল্পের নামকরণে সার্থকতা বিচার কর।

৭.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১। সম্পাঃ আশিস পাঠক, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, ১৪২২, বৈশাখ।

২। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, ১ম খণ্ড, পুস্তক বিপণি, কল-৯, ১৯৮৫, অগাস্ট।

৩। ভূদেব চৌধুরী ,বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডাণ বুক এজেন্সি, কল-৭৩, ১৯৬২।

৪। সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ, প্রজ্ঞা বিকাশ, কল-৯, ১৪০৫, আষাঢ়।

৫। সুরজিত দাশগুপ্ত, বাংলা ছোটোগল্পের সূচনা ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, ১৪১২, মাঘ।

উপসংহার

শিল্প সাহিত্যের একটা তির্যক তাৎপর্য থাকে। যে শিল্প তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে তার শিল্পগুণ নেই বলা যেতে পারে পারে। খানিকটা সংশয় ও খানিকটা অবিশ্বাস নিয়ে

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্পের গল্প কয়টি পড়তে বসে আবিষ্কার করতে হয় প্রকৃত প্রেমেন্দ্র মিত্রকে।

তাঁর গল্পের পাত্র পাত্রীরা যেন সব দিক থেকে নিরালম্ব। আদর্শের দিক থেকে, চিন্তার দিক থেকে মূল্যবোধের দিক থেকে নিজেদের পরিচয় দেবার ইচ্ছা যেন তাদের নেই। ক্ষমতাও চলে গেছে। সেদিক থেকে গল্পের পাত্র পাত্রীরা আধুনিক ছোটগল্পের নিয়ম মেনে চলে। মানুষের অমোচনীয় নিয়তির কথা আজকের ছোটগল্পের বিশেষ রূপ।

সারাজীবন ধরে ছোটগল্পে একটি মানুষের সমগ্র অর্থ খুঁজতে চেয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। খুঁজতে চেয়েছেন কোথায় তার অবস্থান। আধুনিক গল্পের আইডেনটিটি ক্রাইসিসিকেও তিনি গল্পের থীম হিসেবে এনেছেন। লেখকদের প্রিয় বিষয় প্রেমকে তিনি কখনও উচ্চকণ্ঠ হতে দেননি, মানবতাকে খুব কম গল্পেই বিজয়ীর ভূমিকা দিয়েছেন। তাঁর বহু গল্পে তিনি বারে বারে এক ভয়ঙ্কর খেলায় নেমেছেন যেখানে ভবিতব্যের সঙ্গে তাঁর লড়াই। সে লড়াই এ তাঁর অসহায়ত্ব ধরা পড়েছে প্রতিবারই। চেষ্টা করলেও যে ক্রীড়াভূমি থেকে পালাবার তাঁর পথ নেই।